HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০১ ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি
টপিক ০২: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন
টপিক ০৩: ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ
টপিক ০৪: ১৮৫৭ সালের বিপ্লব
টপিক ০৫: সংস্কার আন্দোলনঃ হাজি মুহাম্মদ মোহসিন, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী
টপিক ০৬: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল
টপিক ০৭: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
টপিক ০৮: লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব
টপিক ০৯: ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: প্রারম্ভিক আলোচনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রারম্ভিক আলোচনা

ভারতীয় উপমহাদেশের অফুরন্ত সম্পদ এবং ঐশ্বর্য যুগে যুগে বিদেশিদের আকৃষ্ট করেছে। ইউরোপীয় বণিক, সৈনিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং রাজদূতগণ এদেশের স্বর্ণ, হীরা-মানিক, দারুচিনি, এলাচ, জগদ্বিখ্যাত মসলিন ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ ও হতবাক হয়েছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সৃষ্টির ফলে ভারতে আসার প্রথম প্রচেষ্টা চালায় পর্তুগাল ও স্পেনের নাবিকরা। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সফল হন ভাস্কো-ডা-গামা। তার দেখানো পথ ধরে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি বণিক এদেশে আসে। বিদেশি বণিকরা বাণিজ্যের পাশাপাশি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এবং সফলও হয়। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে এদেশীয়রা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। গঠিত হয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্রিটিশবিরোধী সফল আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এ অধ্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ হতে শুরু করে ফরায়েজি আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের বিপ্লব, সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

মধ্যযুগে আরব বণিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এদেশীয় পণ্য ইউরোপের ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বন্দরে নিয়ে যেত। আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভাস্কো-ডা-গামা যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হলেন, তখন ভারতবর্ষের সাথে ইউরোপীয় দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এ জলপথ দিয়েই পর্তুগিজ, ডাচ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

চিত্র : ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে আগমনের পথ

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

পর্তুগিজ

ভারতের সর্বপ্রথম আগমন করে পর্তুগিজরা। দুঃসাহসী পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগিজদের মধ্যে প্রথম সমুদ্রপথে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। তার আসার পর পরই পর্তুগিজরা এদেশে আসতে শুরু করে। বাণিজ্যকে মূলধন করে পর্তুগাল থেকে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে আসলেও ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখে। পর্তুগিজরা যে কালিকট বন্দরে প্রথম অবতরণ করেছিল, তার সমৃদ্ধি ঘটেছিল আরব বণিকদের হাতেই। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামার পরবর্তী পর্তুগিজ বণিক আলভারেজ কাব্রাল (Alverez Cabral) আরব বণিক এবং নাবিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে কালিকট বন্দর থেকে বিতাড়িত করেন। ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে আলবুকার্ক ভারতের গোয়ায় পর্তুগিজ রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আসেন। তার সময়েই এশিয়ার চারদিকের নৌপথে পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত তিনিই ভারতবর্ষে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

পর্তুগিজ

ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে নতুন রাজ্য গ্রাস করার জন্য পর্তুগিজরা অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। পাশাপাশি স্থল ও নৌপথে দস্যুবৃত্তি চালাতেও পর্তুগিজরা দ্বিধা করত না। উনিশ শতকের ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "পর্তুগিজরা প্রধানত ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য বিদেশে যেত। কিন্তু ঐ সময়ের ডাচরা ইংরেজদের মতোই সুযোগ পাওয়া মাত্রই লুণ্ঠন করত।" ধর্ম বিষয়ে তারা অসহিষ্ণু ছিল এবং অধিকৃত অঞ্চলে তারা যে নীতি গ্রহণ করত তা হলো- 'হয় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর'।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

পর্তুগিজ

আলবুকার্কের পরবর্তী পর্তুগিজরা অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই (মুম্বাই), লালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে কুঠি স্থাপন করে এবং কুঠিগুলোকে দুর্গে পরিণত করে। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও-এ শুল্ক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। হুগলি নামক স্থানে ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে। এরপর তারা উড়িষ্যা এবং বাংলার কিছু অঞ্চলে বসতি সম্প্রসারণ করে। পর্তুগিজরা কেবল ব্যবসায় বাণিজ্যই করত না, তারা এদেশের জমিদার ও প্রতাপশালী বারো ভূঁইয়াদের সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। আবার সুযোগ পেলেই জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করত। অনেক সময় সম্রাট বা নবাবের আইন অমান্য করে বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালাত। এছাড়াও তারা জোর করে এদেশের অসহায় বালক-বালিকাদের খ্রিষ্টান বানাত। এদেশের মানুষকে ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে

দাসদাসীরূপে বিক্রয় করত। পর্তুগিজ সৈন্যরা জোর করে এদেশের মেয়েদের বিয়ে করত। তাদের এ অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে কাসিম খান পর্তুগিজদের হুগলি কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন। সর্বশেষ বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ঘাঁটি দখল করে বাংলা থেকে বিতাড়ন করেন।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

পর্তুগিজ

সর্বোপরি ভারতবর্ষে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে পর্তুগিজরা চিরতরে এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে আগত প্রথম ইউরোপীয় যারা ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এদেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। সুস্বাদু ফল আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙ্গা প্রভৃতি তারাই এদেশে প্রচলন করে।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

ডাচ বা ওলন্দাজ

নেদারল্যান্ডস বা হল্যান্ডের অধিবাসীরা ইতিহাসে ডাচ বা ওলন্দাজ নামে পরিচিত। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চারটি ডাচ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করে। প্রাচ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের একদল বণিক 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসে। নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্ট এক চার্টার বা অনুমতিপত্রে এ কোম্পানিকে ডাচ জাতির পক্ষে যুদ্ধ বা সন্ধি, রাজ্য জয় ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার প্রদান করেছিল। সেই সনদ অনুযায়ী কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া ও বাকুড়াসহ বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং বরানগরে তারা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন - করে। ওলন্দাজরা প্রথমে ইংরেজদের সাথে রেশমি সুতা, সুতি কাপড়, চাল, ডাল ও তামাক এদেশ থেকে রপ্তানি করত এবং অন্যান্য দেশ থেকে এদেশে - মসলা আমদানি করত। ইংরেজদের সাথে তাদের যে বাণিজ্য চুক্তি হয়, দুই - বছরের মধ্যে তা ভেঙে গিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। পাশাপাশি বাংলার শাসনকর্তাদের সাথেও তাদের প্রবল বিরোধ শুরু হয়। এ সুযোগে ইংরেজরা ওলন্দাজ কুঠিগুলো দখল করে নেয়। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে তারা ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়। সেখানে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে ভারতবর্ষে এদেশে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

ডাচ বা ওলন্দাজ

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

ইংরেজ

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জব চার্নক ভাগীরথী নদীর তীরে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এ তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনে নেন। এ তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই বর্তমান কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীকালে এখানেই ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণকারী দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হয়, যা ইংরেজ শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা বাংলা, মাদ্রাজ (চেন্নাই) ও বোম্বাইয়ে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে থাকে। পাশাপাশি তারা নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনেরও অধিকার লাভ করে। সম্রাট ফররুখশিয়ারের এ ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলে মন্তব্য করেছেন। এ অধিকার লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

ফরাসি

ফ্রান্সের অধিবাসীরা ইতিহাসে ফরাসি নামে অভিহিত। ভারতবর্ষে ফরাসিদের আগমন সবার শেষে। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী কলভেয়রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। সম্রাট লুই ব্যবসায়ের জন্য এ কোম্পানিকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করেন। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ফ্যারোঁ সুরাটে প্রথম ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। এরপর ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসিরা মসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন এবং ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজদের কাছ থেকে সানটুম বাণিজ্য কুঠি দখল করে নেয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসিরা পণ্ডিচেরীতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। ফ্রাঁসোয়া মার্টিন, ডুপ্লে ও দুমার ঐকান্তিক চেষ্টায় পণ্ডিচেরী সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয় কোম্পানি

ফরাসি

১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসিরা বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী চন্দননগর কিনে নেয়। পরবর্তীতে চন্দনগর ১৬৯০ থেকে ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একটি শক্তিশালী ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি চন্দননগরে একটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করে এবং ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় কাশিমবাজার ও বালেশ্বরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির মতো ফরাসিরাও ভারতবর্ষে বাণিজ্যের পাশাপাশি সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে একই স্বপ্ন দেখা ইউরোপীয় দুই শক্তি- ইংরেজ ও ফরাসিদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরেজরা উন্নততর সামরিক শক্তি, কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। উপরন্তু ১৭৫৭খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় এবং ইংরেজদের যুদ্ধ জয়ের সাফল্য তাদেরকে আরও দুর্বল করে দেয়। ফলে ইংরেজরা ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসিদের চন্দননগর এবং ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী বাণিজ্য কুঠি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে পর পর তিনটি দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হলে তাদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তাদের বাধ্য হয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং ভারতবর্ষে ইংরেজরা একক আধিপত্য বিস্তার করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০২ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ
লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

টপিক ০২: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানি প্রথম এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রথম রাজকীয় সনদ বা চার্টার প্রদান করেন। তখন এর নাম ছিল 'The Governor East India'. ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি কলকাতায় ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর-এ তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করে কোম্পানি। এরপর ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার এক ফরমানে বাংলা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়। এর ফলে কোম্পানি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ষড়যন্ত্রীদের সাথে আঁতাত করে। ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং কূটকৌশলে বিজয়ী হয়। এরপর থেকে রবার্ট ক্লাইভ সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের দিওয়ানি লাভ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর মাধ্যমেই তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ভারতবর্ষে বাণিজ্য বৃদ্ধির পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রাজ্য স্থাপন ও শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ফলে উক্ত বছরে ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ হয় এবং ইংরেজরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়। এ পরিস্থিতিতে জব চার্নক নামক একজন দূরদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা আপস করার চেষ্টা করেন। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতার সুতানটিতে ফিরে আসেন। মূলত তার সময়ই অর্থাৎ ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা নগরীর পত্তন হয়। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য কুঠিগুলো একত্রিত করে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবগঠিত কাউন্সিলের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে এবং চার্লস আয়ার এর প্রথম প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর নিযুক্ত হন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজরা ইতোমধ্যে বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত শুধু ফরাসিরা বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য নানা রকম কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মুঘল রাজদরবারে অব্যাহত দূত প্রেরণ করতে থাকে। এ নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার এক ফরমানের মাধ্যমে ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে অনুমতি লাভ করেছিল, সেই তিন হাজার টাকা উঠিয়ে দিয়ে কোম্পানিকে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন। একই সাথে ইংরেজরা নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করে। ভারতীয় শাসকদের এ অদূরদর্শিতার সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে খুব দ্রুত সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায়। পাশাপাশি সাম্রাজ্য স্থাপনের নীলনকশা আঁকতে থাকে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

অনেক ঐতিহাসিক মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের এ ফরমানকে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুনিপুণভাবে স্থাপন করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

চিত্র : ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

নবাব আলীবর্দি খান

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলীবর্দী খান একটি অবিস্মরণীয় নাম। তার প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলী এবং জাতিতে তিনি ছিলেন তুর্কি বংশীয়। প্রথমে তিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পরে স্বীয় যোগ্যতায় ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে বাংলার নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন।

মারাঠা বা বর্গী দমন তার শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজদের সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ ছিলেন এবং ইংরেজরাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলত। নবাব আলীবর্দী খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না; ছিল ঘসেটি, মায়মুনা ও আমেনা নামে তিন কন্যাসন্তান। আমেনা ও মায়মুনার দুই পুত্র ছিল; কিন্তু ঘসেটি বেগমের কোনো পুত্র ছিল না। আলীবর্দী খান আমেনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই মৃত্যুর পূর্বেই তিনি সিরাজকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

নবাব আলীবর্দি খান

১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মির্জা মুহম্মদ হাসিম জয়নুদ্দিন খান। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর মাত্র ২২ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসার পর থেকেই সিরাজ নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কেননা তার সিংহাসন আরোহণকে আলীবর্দী খানের অপর দুই কন্যা সহজে মেনে নিতে পারেননি। বিশেষ করে তার বড় খালা ঘসেটি বেগম সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে মসনদে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এতে ইন্ধন যোগায় ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

নবাব আলীবর্দি খান

অন্যদিকে নবাবের প্রধান সেনাপতি ও বখশী মীর জাফর ও কুচক্রীর ভূমিকা পালন করে। এদের প্ররোচনা ও সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ সিরাজের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করেন এবং তার আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণ করার পর পরই উপলব্ধি করেন, ঘরের শত্রুকে দমন করতে না পারলে তার মসনদ নিষ্কণ্টক হবে না। তিনি প্রথমে প্রশাসনে কতিপয় রদবদল করেন। বখশির পদ থেকে মীর জাফরকে অপসারণ করে মীর মদনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি পদে মীর জাফরকে বহাল রাখেন। তাছাড়া তার পারিবারিক দেওয়ান মোহনলালকে সচিব পদে উন্নীত করেন এবং তাকে মহারাজা উপাধিসহ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মোহনলালের পিতৃব্য জানকিরামকে 'রায় রায়ান' উপাধিসহ নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এরপর নবাব শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। তিনি ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ অবরোধ করে ধনরত্নসহ তাকে নবাবের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে নিয়ে এসে কৌশলে নজরবন্দি রাখেন। তখন খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ করলে তাকে দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যুদ্ধে শওকত জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুনভাবে শুরু হয়। একদিকে রাজদরবারের প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অপরদিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রতিনিয়ত তারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হতে থাকে। বস্তুত ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর সাথে পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাই ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে নবাব বাহিনী পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের কারণ: পলাশীর যুদ্ধের বেশকিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। এ কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. নবাবের প্রতি অসম্মান: সিরাজ যখন মসনদে বসেন তখন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্য ইউরোপীয় বণিকগণ উপঢৌকনসহ তাঁকে অভিনন্দন জানায়, কিন্তু ইংরেজ বণিকরা তা করেনি। এ স্বীকৃত রীতি উপেক্ষা করায় নবাবের প্রতি অসম্মান করা হয়। এতে সিরাজ অপমানিত বোধ করেন এবং ক্ষুব্ধ হন।

২. দত্তক অপব্যবহার: বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ইংরেজরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে অবাধে 'দস্তক' ব্যবহার শুরু করলে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাব বাণিজ্য শর্ত মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করলে ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

৩. ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ: ইংরেজরা নবাব আলীবর্দী খানের সময় বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। কিন্তু সিরাজের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। এ আদেশ ফরাসিরা মান্য করলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। এজন্য নবাব তাদের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

৪. অস্বীকৃতি: ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে ও নবাবকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

৫. ইংরেজদের শওকত জঙ্গকে সমর্থন: পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা নবাবের বিপক্ষকে সমর্থন ব্যক্ত করে। এতে নবাব ইংরেজদের ওপর অসন্তুষ্ট হন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

৬. কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়: ঘসেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও তার পরিবার প্রচুর ধনদৌলতসহ কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষ্ণদাসকে নবাব সরাসরি তার নিকট সমর্পণের জন্য নারায়ণ দাসকে দূত হিসেবে ইংরেজদের কাছে পাঠান। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর ড্রেক নবাবের দূতকে কলকাতা থেকে অপমানিত করে বের করে দেন ও কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। ইংরেজদের এসব আচরণে নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

৭. অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা প্রচারণা: ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব ইংরেজদের ধৃষ্টতায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ৪ জুন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন। নবাবের এ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে গভর্নর ড্রেক ও তার সঙ্গীরা ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে 'ফুলতা' নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। ফলে সহজেই নবাব কলকাতা দখল করেন ও আলীবর্দী খানের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'আলীনগর'।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন মি. হলওয়েল ও তার সঙ্গীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আত্মসমর্পণের পর কোনো ইংরেজের ওপর অত্যাচার করা হয়নি। অথচ হলওয়েল মুক্তি পেয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪.১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। বাকি ২৩ জন কোনো রকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এ কাহিনি ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনির পিছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংরেজদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই ছিল এ কল্পিত কাহিনির উদ্দেশ্য।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

৮. আলী নগরের সন্ধি: নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা অধিকার করার পর সেনাপতি মানিক চাঁদকে কলকাতা রক্ষার দায়িত্বে রেখে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। ইতোমধ্যে অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি এবং নবাব কর্তৃক কলকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছলে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভ মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙে কলকাতা পুনরায় দখল করেন। নবাব চারদিকে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল লক্ষ করে ইংরেজদের সাথে এ অবস্থায় এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এ সন্ধিই বিখ্যাত 'আলীনগরের সন্ধি' নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানুসারে নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি প্রদান, টাকশাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার করার অনুমতি প্রদান করতে বাধ্য হন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ক্লাইভ এরপরও নবাবের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

৯. নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র: বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য লর্ড ক্লাইভ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার লক্ষ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী কুচক্রী, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী দলের সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। ইউরোপে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে সে সূত্র ধরে নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাইভ ফরাসি বাণিজ্য কুঠি চন্দননগর দখল করে নেয়। ফলে আত্মরক্ষার্থে ফরাসিরা মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজদের এ অশোভন উদ্ধত আচরণের জবাব দেওয়ার জন্য সিরাজ দাক্ষিণাত্যের ফরাসি সেনাপতি বুসীর সাথে পত্রালাপ করেন। দূরদর্শী ক্লাইভ নবাবের এ কাজের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে সিরাজের পরিবর্তে তার মনোনীত প্রার্থী প্রধান সেনাপতি আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এসব ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে ছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, সেনাপতি মীর জাফর ও রায়দুর্লভ, আস্থাভাজন উমিচাঁদ, দেওয়ান রাজবল্লব প্রমুখ। নবাবির বিনিময়ে ইংরেজদের পৌনে দুই কোটি টাকা প্রদানের অঙ্গীকারে ক্লাইভের সাথে মীর জাফর আলী খান এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ গোপন চুক্তির কথা উমিচাঁদ ফাঁস করার ভয় দেখালে ক্লাইভ তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারসহ একটি জাল চুক্তিপত্র তৈরি করেন। এ জাল চুক্তিপত্রে ওয়াটসন স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ক্লাইভ নিজেই তাতে স্বাক্ষর করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের ঘটনা: নবাবের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হলে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরেজদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে নবাব আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি ৫০টি কামানসহ ৫০ হাজার পদাতিক ও ১৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দিলেন। অন্যদিকে, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন ক্লাইভ ৮টি কামানসহ ১,০০০ জন ইউরোপীয় ও ২,০০০ জন দেশীয় সৈন্যসহ পলাশীর আম্রকাননে অবস্থান নিলেন।

বাংলার ভাগ্য ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে নির্ধারণ হয়ে যায়। ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী যখন দেশপ্রেমিক মীর মদন ও মোহনলালের আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত তখন মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব। দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন। মীর মদন এসময় হঠাৎ গোলার আঘাতে নিহত হলে মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

নবাব মীর মদনের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে তাৎক্ষণিক ডেকে পাঠান এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার মিথ্যা শপথ করেন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। এদিকে মোহনলাল ও সিনফ্রের বাহিনী যখন নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিতের পথে নিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মীরজাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

যুদ্ধ বিরতির ফলে নবাব বাহিনী যখন রাতে বিশ্রামরত তখন মীরজাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ বাহিনী রণক্লান্ত নবাব শিবির আক্রমণ করে সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে নবাব পরাজিত হন।

নবাব পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং অবশেষে স্ত্রী লুৎফুননেসা ও কন্যাকে নিয়ে নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহলের পথে ভগবানগোলায় ধৃত ও বন্দি হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে মীরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আর এভাবেই দেশপ্রেমের পরাজয় হলো আর বিশ্বাসঘাতকদের জয় হলো পলাশীর প্রান্তরে। প্রশস্ত হলো ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিজয়ের পথ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

নবাবের পতনের কারণ: পলাশীর যুদ্ধ মূলত বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল না; ছিল একটি খণ্ড যুদ্ধ। কেননা এ যুদ্ধের পরিস্থিতি ও গুরুত্ব বিচার করলে এ যুদ্ধকে কখনই বিরাট যুদ্ধরূপে চিহ্নিত করা যায় না।

চিত্র : পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ লক্ষ করা যায়। যেমন-

প্রথমত: মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পরাজয়ের প্রধান কারণ। প্রধান সেনাপতি হিসেবে বিজয়ের মুহূর্তে তিনি নবাবকে ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয়ত: নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যধিক স্নেহপ্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। ফলে সংকট মুহূর্তে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতার কারণে তিনি কারও বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহসী হননি।

তৃতীয়ত: পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তার সমরনীতির অপরিপক্বতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে, যা তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

চতুর্থত: ফরাসিরা তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পরও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। নবাব আলীবর্দী খানও মৃত্যুর আগে সিরাজকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে যান। মূলত নবাবের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব দেখা দিয়েছিল।

পঞ্চমত: নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও কর্মচারী, সভাসদ, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, ধনকুবের ও সৈন্যরা দ্বিধাবোধ করেনি।

ষষ্ঠত: রবার্ট ক্লাইভ সূক্ষ্ম কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাব অপেক্ষা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব: ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি বেদনাবহুল খণ্ড যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পাশাপাশি বিশেষ করে ইংরেজদের অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এ যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যেমন-

প্রথমত: পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত: মীরজাফর এ যুদ্ধের ফলে নামেমাত্র নবাব হলেন; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে গেল ইংরেজদের হাতেই।

তৃতীয়ত: ভারতবর্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছ থেকে নগদ দেড় কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারি লাভ করেন। ফলে ইংরেজদের বাংলার রাজনীতিতে যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়।

চতুর্থত: ইংরেজরা এ যুদ্ধের ফলে বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে। ফলে এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ

পঞ্চমত: ইংরেজরা এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে বাংলাসহ দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।

ষষ্ঠত: ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এ যুদ্ধের ফলে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

সপ্তমত: পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতবর্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন তারিখেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগ শেষে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল।

THANK YOU

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ বাংলার মসনদ লাভ করেন। কিন্তু রাজকোষ শূন্য থাকায় মীরজাফর তার ব্যক্তিগত স্বর্ণালংকার, হীরা, জহরত ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রতিশ্রুত দেড় কোটি টাকা ও দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ফলে দেউলিয়া হয়ে তিনি ইংরেজনির্ভর হয়ে পড়েন। এছাড়াও ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় সেনাবিদ্রোহ দেখা দিলে ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হলেও বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবাবি পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা ভোগ করার ক্ষমতা মীরজাফরের ছিল না। এ কারণে মীরজাফর ঔদ্ধত্য ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার অযোগ্যতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না দেওয়ার অজুহাতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্থায়ী গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের প্রস্তাবক্রমে মীর জাফরকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত করা হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

এরপর ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তিনিও কোম্পানিকে অনেক সুবিধাদানের শর্তে ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু মীর কাশিম মীর জাফরের মতো অপদার্থ, অযোগ্য ও হীন চরিত্রের ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তাই ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে তিনি আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যা হীন চরিত্রের অধিকারী মীর জাফরের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত নবাব মীর কাশিমও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তাই ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে তার পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজ আধিপত্য ভারতবর্ষের গভীরে প্রোথিত হয়। ফলে বাংলার স্বাধীন হওয়ার শেষ আশার আলোটুকুও নিভে যায়।

বস্তুত অযোদ্ধার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তায় গড়ে তোলা মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে মীর কাশিম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সারের যুদ্ধের কারণ: বাংলার মসনদে আরোহণ করেই মীর কাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে তারাই এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে ভবিষ্যতে ইংরেজদের সাথে তার সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। কেননা ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার মতো হীন মনোবৃত্তি তার ছিল না। তাই তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে দেশ, জাতি ও স্বীয় স্বার্থে তিনি কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা বক্সারের যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়। যেমন-

প্রথমত, রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসনকার্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ স্বাধীনচেতা মীর কাশিমের নিকট অসহনীয় ছিল। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন এবং চারপাশে পরিখা খনন ও দুর্গ নির্মাণ করে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে পারে। এ সন্দেহের দরুন মীর কাশিমকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য তিনি সামরু ও মার্কার নামে দুজন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ বাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকার জন্য তিনি মুঙ্গেরে কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণেরও ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয়ত, মীর কাশিম বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজপ্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষ করে তাকে পদচ্যুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে মীর কাশিমের কার্যকলাপ ইংরেজদের মনে অসন্তোষ ও সন্দেহের সৃষ্টি করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

চতুর্থত, মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার কর্তৃক ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত ফরমান বলে কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার লাভ করেছিল, তা অমান্য করে কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রে আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্যসংক্রান্ত কথাটি লিখিয়ে বিনা শুল্কে কোম্পানির মাল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করে। ফলে দেশীয় বণিকগণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নবাব নিজে ও প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হন।

পঞ্চমত, মীর কাশিম দস্তকের অপব্যবহার সম্পর্কে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু নবাব প্রতিকার না পেয়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর ওপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে নবাবের রাজস্ব আয় কমে গেলেও দেশীয় বণিকদের সাথে বিদেশি বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ নতুন ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগে; যার দরুন সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সারের যুদ্ধের ঘটনা: ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ
এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে তা দখল করেন। ফলে বাধ্য হয়ে নবাবকে এলিসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। মীর কাশিম পাটনা হতে এলিসকে বিতাড়িত করে পাটনা পুনরুদ্ধার করলে কলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু নবাব তার সৈন্যসংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নেন।
ইংরেজরা ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আবার মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম কর্তৃক জারিকৃত সর্কল ঘোষণা ও বিধি নতুন নবাব মীর জাফর প্রত্যাহার করে নেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সারের যুদ্ধের ঘটনা: ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ
এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে তা দখল করেন। ফলে বাধ্য হয়ে নবাবকে এলিসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। মীর কাশিম পাটনা হতে এলিসকে বিতাড়িত করে পাটনা পুনরুদ্ধার করলে কলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু নবাব তার সৈন্যসংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নেন।
ইংরেজরা ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আবার মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম কর্তৃক জারিকৃত সকল ঘোষণা ও বিধি নতুন নবাব মীর জাফর প্রত্যাহার করে নেন।
অন্যদিকে মীর কাশিম পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তায় ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।
১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সারে
উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। ইতিহাসে এটি বক্সারের যুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মীর কাসিমের সম্মিলিত এ বাহিনী মেজর মনরোর বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সার যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যেমন-

প্রথমত, দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলম এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করেন।

দ্বিতীয়ত, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে যান। আর মীর কাশিম আত্মগোপন করেন। অবশেষে ১৭৭৭খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সন্নিকটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয়ত, মীর কাশিমের ইংরেজ বিতাড়ন ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ আশা-ভরসাটুকুও এ যুদ্ধের ফলে ধূলিসাৎ হয় এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মোচিত হয়।

চতুর্থত, কোম্পানি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দুটি কেড়ে নেয়। কারণ এ যুদ্ধে কেবল মীর কাশিমই পরাজিত হননি; স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম এবং সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে দিল্লি থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

বক্সারের যুদ্ধ

পঞ্চমত, ক্লাইভ এ যুদ্ধের ফলে দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করেন। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনগত স্বীকৃত হয় ও কোম্পানি অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিক জেমস স্টিফেন্স এ প্রসঙ্গে বলেন, "ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে ভারতবর্ষে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" কারণ মীর কাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবি আমল শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজরা গ্রাস করে এবং পরবর্তী ঘটনাবলি ছিল শুধু তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনের যুগ মাত্র।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পট পরিবর্তনকারী যুদ্ধ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বিদেশি বণিক সংস্থা। ভারতে এ কোম্পানির তিনটি ঘাঁটি ছিল। যেমন- কলকাতায়, বোম্বে ও মাদ্রাজে। তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরুর দিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত হতো। বাংলার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, দলাদলি, দুর্নীতি, প্রশাসকদের দূরদর্শিতার অভাব প্রভৃতি কারণে কোম্পানি বাংলার রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সামরিক দিক থেকেও তারা বাংলার সেনাবাহিনীর সমকক্ষতা অর্জন করে। ফলে বাংলার নবাব বনাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মধ্যে শুরু হয় সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। কৌশল আর ষড়যন্ত্রের কাছে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মীর কাশিম হেরে যান। ফলে বাংলার সিংহাসন হয়ে পড়ে অরক্ষিত। এ সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিংহাসন দখল করে।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বনাম বাংলার নবাবদের মধ্যে কমপক্ষে ৬টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।' এ ৬টি যুদ্ধের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাকারী হিসেবে পলাশীর যুদ্ধ বা বক্সারের যুদ্ধ এর যেকোনো একটি বা উভয়কে ধরা যেতে পারে। আমরা বর্ণিত দুটি যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিকদের মতামতের ভিত্তিতে এর তুলনা করতে পারি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

ক. পলাশীর যুদ্ধ:

স্থান : বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পলাশী নামক স্থানের আম বাগান।

সময় : ২৩ জুন, ১৭৫৭ সাল।

১ম পক্ষ : বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

২য় পক্ষ : ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

ফলাফল: ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের নিষ্ক্রিয়তায় বিজয়ী।

মূল্যায়ন: নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরে বাংলার নবাব হন মীর জাফর আলী খান। পলাশীর যুদ্ধ ছিল মীর জাফর ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত। মীর জাফর যুদ্ধের পূর্বেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

চুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সব রকমের বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে।

২. টাকা তৈরির অধিকার ইংরেজ কোম্পানি পাবে।

৩. সামরিক ব্যয় উসুল বাবদ কোম্পানি ২৪ পরগনা জেলার জমিদারি পাবে।

৪. কলকাতার ওপর নবাবের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

৫. মুর্শিদাবাদ বা রাজধানীতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকবে।

৬. যেকোনো প্রয়োজনে কোম্পানি বাংলার নবাবকে সামরিক সাহায্য দিবে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে মীর জাফর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন এবং পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সকল শর্তাদি পূরণ করেন। মীর জাফরের শাসনামলে বাংলায় তিনটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেমন- মেদিনীপুরের জমিদার রাজারাম সিংহের বিদোহ, পূর্ণিয়াতে হযরত আলী শাহ ও অচল সিংহের বিদ্রোহ এবং পাটনায় রামায়ণের বিদ্রোহ।

এসব বিদ্রোহ দমনে নবাব মীর জাফরকে কোম্পানির কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিতে হয়েছিল। এসব বিদ্রোহ দমনে সামরিক সাহায্য করার জন্য কোম্পানি নবাবের কাছে প্রচুর টাকা দাবি করে। নবাবের কাছে তখন কোম্পানির দাবি পূরণ করার মতো টাকা ছিল না। নবাব বাধ্য হয়ে নদীয়া ও মেদিনীপুর এবং পরে চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু কোম্পানির চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। কোম্পানির চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে মীর জাফরকে পদচ্যুত করে তারই জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

খ. বক্সারের যুদ্ধ:

স্থান : ভারতের বিহারের বক্সার নামক প্রান্তর

তারিখ : ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ সাল।

১ম পক্ষ : বাংলার নবাব মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলমকে নিয়ে গঠিত সম্মিলিত জোট।

২য় পক্ষ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

ফলাফল: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয় লাভ করে। মীর কাশিম আত্মগোপন করেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে যান।

আর মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

মূল্যায়ন: ১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মীর জাফর মারা যান। বাংলার নতুন নবাব হন মীর জাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলা। ফেব্রুয়ারি মাসে মীর জাফরের পুত্রের সাথে কোম্পানির একটি চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক ইংরেজদের মনোনীত একজন ব্যক্তিকে বাংলার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

কোম্পানির পক্ষে লর্ড ক্লাইভ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ১২ আগস্ট ১৭৬৫ সালে অযোধ্য (বর্তমান নাম উত্তর প্রদেশ) নবাব ও মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি মোতাবেক-

১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের দেওয়ানি লাভ করে।

২. দেওয়ানির আয় থেকে সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে চাওয়া হয়।

৩. কারা ও এলাহাবাদ সম্রাটকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

৪. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা কোম্পানি গ্রহণ করে।

৫. বাংলার নবাব মীর জাফর পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে চাওয়া হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের প্রকৃতি ও ফলাফল থেকে বলা যায়, বক্সারের যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলে এলাহাবাদের চুক্তি হয়। যেহেতু বাংলার নবাব কার্যত স্বাধীন হলেও তারা কেউই মুঘল সম্রাটের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তাই বলা যায়, বাংলার প্রকৃত মালিক ছিলেন মুঘল সম্রাট। মুঘল সম্রাটের সাথে চুক্তি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের বৈধতা পায়। বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হতে Ruling Company-তে পরিণত হয়। বক্সারের যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বকে মোকাবিলা করার মতো আর কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা

আবার বলা যায়, বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অধিক লাভবান হয়। পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পরও কোম্পানিকে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তাদের আর কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি।

এছাড়া দেওয়ানি লাভের ফলে ইংল্যান্ডে প্রচুর অর্থ পাচার করে। বাংলা হয়ে পড়ে কোম্পানির মূল দেশ ইংল্যান্ডের কলোনি। এভাবে ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়।

Sir James Stephen বলেন, "The battle of Boxer deserves for more credit than the battle of Plassey as the origin of the British power in India."

ভারতীয় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, “বক্সারের যুদ্ধকে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ ও আধুনিক" যুগের বিভাজন রেখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর ভারতীয় অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ ১৭৬৫ সাল হতে আধুনিক ভারতের সাল গণনা করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

রবার্ট ক্লাইভ এর পরিচয়

রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানি হিসেবে যোগদান করেন। তার প্রথম কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজ। কিছুদিন পরে তিনি কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোম্পানির সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোম্পানির ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান। তার রণকৌশলে ও নিপুণতায় কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী ফরাসিদের বিপক্ষে জয় লাভ করে। ক্লাইভের রণনৈপুণ্য, সাহস ও বিচক্ষণতায় ইংরেজ কোম্পানি সুনাম, খ্যাতি অর্জন করে এবং ইংরেজ কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে শঠতা, কৃষকসহ প্রজাদের ওপর নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগ ছিল। পরে লন্ডনের পার্লামেন্টে তিনি বিচারের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ক্লাইভ ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর লন্ডনে আত্মহত্যা করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মুঘল আমলে প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে একটি সুবাদারি ও দিওয়ানি ক্রমে দুটি সমমর্যাদাসম্পন্ন পদ ছিল। দুজনে সরাসরি মুঘল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং তার নিকট জবাবদিহি করতেন। বিচার, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন ছিল সুবাদারের দায়িত্বে এবং রাজস্ব প্রশাসন ছিল দিওয়ানের দায়িত্বে। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান দুটি পদ একাই দখল করেন। পলাশী যুদ্ধের পর হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই ছিল বাহ্যত সকল বিষয়ের হর্তাকর্তা। মীর কাশিম ইংরেজদের প্রভাব বলয় হতে বের হতে বক্সারের যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছেন। বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বাংলার ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু এ ক্ষমতা লাভের পক্ষে আইনগত কোনো ভিত্তি ছিল না। মুঘল সম্রাট শাহ আলম দুর্বল শাসক হলেও আইনগতভাবে তিনিই ছিলেন ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাটের নিকট হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি সনদ লাভ করে। শর্ত হলো সুবা বাংলার রাজস্ব আয় থেকে কোম্পানি সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবে আর নিজামত শাসনের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবকে দিবে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ

দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব: ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কোম্পানির দিউয়ানি লাভের গুরুত্ব অত্যধিক

প্রথমত, কোম্পানির জন্য দিউয়ানি লাভ ছিল একটি বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। এর ফলে সম্রাট ও নবাব একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুল বনে যায়। নবাবের না ছিল রাজস্ব আদায়ের অধিকার, না ছিল সেনাদল রাখার মতো অর্থবল। নবাবকে নামমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে রেখে কোম্পানিই সকল ক্ষমতা অধিকার করে নেয়।

দ্বিতীয়ত, দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য আরও একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিজয়। কোম্পানি এর ফলে নিজের দেউলিয়া অবস্থা হতে রক্ষা পায়। Court of Directors-কে দিউয়ানি লাভের সুযোগ-সুবিধা অবহিত করতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভ বলেন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা এত বেশি যে, সম্রাট ও নবাবের নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক খাতে সমস্ত ব্যয় বাদ দিলেও কোম্পানির হাতে নেট আয় থাকবে ১২ কোটি টাকারও ওপর (১৭৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দের রাজস্ব হিসাব থেকে)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ

তৃতীয়ত, লর্ড ক্লাইভ Court of Directors-কে আরও জানান, ওই উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানির গোটা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট। ফলে দিউয়ানি লাভের আগে এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ হতে কোম্পানির যে বিপুল পুঁজি নিয়ে আসত তা দিউয়ানি লাভের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবসার সমস্ত পুঁজি এদেশের রাজস্ব হতেই সংস্থান করা হয়।

চতুর্থত, কোম্পানির কর্মচারীরা দিউয়ানি লাভের ফলে বাংলায় শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসদুপায়ে রাজস্ব আদায় ও আত্মসাৎ করলেও কোম্পানির কর্তারা কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

পঞ্চমত, দিউয়ানি লাভের পর বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ও সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। ফলে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দিউয়ানি প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

ষষ্ঠত, কোম্পানি দিউয়ানি লাভের ফলে সম্রাট ও নবাব উভয়ই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।

সর্বোপরি, ইংরেজরা এ দিউয়ানি লাভের সূত্র ধরেই ভারতবর্ষে প্রায় ২০০ বছর শাসন করে। তাই অনেক ঐতিহাসিক ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ করাকে ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসনের প্রভাব: রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের ফলে জনসমাজে মারাত্মক কুপ্রভাব পড়ে এবং প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে নবাবকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার হাত-পা ছিল বাঁধা। কোম্পানি একই ব্যক্তিকে নায়েব সুবাদার এবং নায়েব দিওয়ান নিয়োগ করে। মুহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করা হয় আবার তাকেই নায়েব দিওয়ান নিয়োগ করা হয়। একইভাবে বিহারে রাজাধিরাজ নারায়ণকে এবং পরে রাজা সিতাব রায়কে নায়েব সুবাদার (নাজিম) ও নায়েব দিওয়ান নিযুক্ত করে। এর ফলে এক দ্বৈতশাসনের মধ্যে আরেক দ্বৈতশাসনের সৃষ্টি হয়। রবার্ট ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য একটি আলাদা সংস্থা গড়ে তোলেন। এর লভ্যাংশ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে দেওয়া হয়। এতে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও বেশকিছু ব্যবসায় বাণিজ্যকে সরকারিকরণ করা হয়। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বৈতশাসনের ফলে নবাবের দায়িত্ব ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। অপরদিকে, কোম্পানির ক্ষমতা ছিল কিন্তু কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

ফলে এ শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি বা নবাব কেউ গ্রহণ করেনি। কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও দ্বৈতশাসনের ফলে কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কৃষকদের ওপর করভার অমানবিক পর্যায়ে পৌছে যায়। অনেকে পেশা পরিবর্তন করে পালিয়ে বেড়ায়। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রেজা খানের অভিযোগ থেকে জানা যায়, আলীবর্দী খানের শাসনামলে পূর্ণিয়া জেলার রাজস্ব ছিল ৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ টাকায় ওঠে। একইভাবে দিনাজপুরের রাজস্ব ১২ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। রেজা খানকে চাপের মুখে এ বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে হয়।

কারণ কোম্পানি শুধু রাজস্ব চাইত কিন্তু জনগণের উন্নয়নে কৃষিখাতে, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে বা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থ ব্যয় করত না। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ রেজা খান কোম্পানির অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। এতে দ্বৈতশাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সামান্য নমুনা ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

রবার্ট ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য একটি আলাদা সংস্থা গড়ে তোলেন। এর লভ্যাংশ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে দেওয়া হয়। এতে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও বেশকিছু ব্যবসায় বাণিজ্যকে সরকারিকরণ করা হয়। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বৈতশাসনের ফলে নবাবের দায়িত্ব ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। অপরদিকে, কোম্পানির ক্ষমতা ছিল কিন্তু কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। ফলে এ শাসনব্যবস্থায় সুশাসনের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি বা নবাব কেউ গ্রহণ করেনি। কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও দ্বৈতশাসনের ফলে কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কৃষকদের ওপর করভার অমানবিক পর্যায়ে পৌছে যায়। অনেকে পেশা পরিবর্তন করে পালিয়ে বেড়ায়। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রেজা খানের অভিযোগ থেকে জানা যায়, আলীবর্দী খানের শাসনামলে পূর্ণিয়া জেলার রাজস্ব ছিল ৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ টাকায় ওঠে। একইভাবে দিনাজপুরের রাজস্ব ১২ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। রেজা খানকে চাপের মুখে এ বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে হয়।

কারণ কোম্পানি শুধু রাজস্ব চাইত কিন্তু জনগণের উন্নয়নে কৃষিখাতে, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে বা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থ ব্যয় করত না। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ রেজা খান কোম্পানির অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। এতে দ্বৈতশাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সামান্য নমুনা ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ ১১৭৬ বাংলা বা ১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। দ্বৈতশাসনের ফলে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা, ইংরেজদের অর্থলোলুপতা, ভূমি রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, কৃষিতে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, প্রাকৃতিক অনাবৃষ্টি সবকিছু মিলিয়ে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধার তীব্রতায় মানুষের আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ তৈরি হয়।

না খেয়ে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। চারদিকে লাশ আর লাশ। ১ (এক) টাকায় যেখানে ১ মণ চাল পাওয়া যেত, এ দুর্ভিক্ষের সময় তখন ৩ সের পাওয়া ছিল দুর্লভ। কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যদ্রব্য মজুদদারি করেন। এর ফলে এ দুর্ভিক্ষ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। মুর্শিদাবাদ হতে কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের একটি রিপোর্ট দেন। তিনি লেখেন, "এ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য, এ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। দেশের কোনো কোনো অংশে, মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত মানুষ ভক্ষণ করছে, তা গুজব নয়, সত্যি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

অনাহারজনিত মৃতের সংখ্যা প্রতি ১৬ জনের মধ্যে ছয় জন।" অনাহারী মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকার বিভিন্ন জেলায় লঙ্গরখানা খোলে এবং কিছু অর্থ বরাদ্দ দেয়। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। এ দুর্ভিক্ষের এক পরোক্ষ ফল ছিল দ্বৈতশাসনের অবসান। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও শোষণনীতি এ মহাদুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার জন্য দায়ী। সে কারণে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দিওয়ানি শাসন সরাসরি হাতে নেওয়ার আদেশ করে। এ আদেশক্রমে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজস্ব শাসনের দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে প্রশাসন যন্ত্রের উচ্চপদ হতে সকল দেশীয়দের সরিয়ে দিয়ে ইংরেজদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবে দ্বৈতশাসনের কালো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

তৃতীয়ত, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনের ফলে অবনতি ঘটে। বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলে বহু বিদেশি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এদের পণ্য কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু কোম্পানির নতুন বাণিজ্যনীতির ফলে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রাধান্য এদেশের ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশীয় ও অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দেশের রপ্তানি আয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। কারণ ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডের বেশি দামি রেশম শিল্পকে বাঁচাতে ইংল্যান্ডে কম দামি মুর্শিদাবাদী রেশম আমদানি বন্ধ করে দেয়। ফলে এদেশের কারিগররা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

চতুর্থত, দেশের সম্পদ কোম্পানির কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও শোষণের ফলে কমতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে; অথচ রাজস্বের হার প্রতিবছর বাড়তে থাকে। যেমন- পূর্ণিয়া জেলার বার্ষিক রাজস্ব যেখানে মাত্র চার লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে তা বেড়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বারো লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে সত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

পঞ্চমত, দ্বৈতশাসনের দায়িত্বহীনতার ফলে একদিকে বাংলার জনজীবনে অরাজকতা নেমে আসে, অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তদুপরি পর পর দুই বছর অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। টাকায় এক মণ হতে চালের মূল্য বাড়তে বাড়তে টাকায় তিন সেরে এসে দাঁড়ায়। কোম্পানির কর্মচারীরা খোলাবাজারের খাদ্যশস্য বেশি লাভের আশায় মজুদ করা শুরু করে। ফলে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্যের আশায় দলে দলে লোক কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে আসে। এসময়েও খাজনা মওকুফ করা হয়নি। ১৭৬৫-৭০ খ্রিষ্টাব্দে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও আদায় প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে গ্রামবাংলা জনশূন্য হয়ে যায়। এ দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো ছিল নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, যশোর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও চব্বিশ পরগনা। বিশেষ ফসলহানি না হওয়ায় বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া 'নাজাই' প্রথার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা ভিটেমাটি ছেড়ে পালায়। 'নাজাই' প্রথার অর্থ ছিল, কোনো একজন রাজস্ব বাকি ফেললে সেই গ্রামের অন্য কৃষকদের সেই রাজস্ব দিতে হতো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

দ্বৈতশাসন

সর্বোপরি ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার একটি ভালো দিক ছিল এই যে, এ ব্যবস্থা মুঘল শাসনব্যবস্থাকে অটুট রেখেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রথমদিকে রাজস্বের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। অন্তত ক্লাইভ যতদিন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ছিলেন, ততদিন রেজা খান কৃতিত্বের সাথে মুঘল প্রথায় শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেলে ফাটল ধরে তার দ্বৈতব্যবস্থায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ছিল। নায়েব নাজিম মুহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ওপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। কোম্পানির চাপে নায়েব নাজিমের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের ওপর অত্যাচার করে হলেও আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে উৎপাদন অনুপাতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের হার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দেয়।

এরূপ বিরূপ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ইংরেজ কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর ভেরেলেস্ট ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় আমিলদার পদের অবসান ঘটিয়ে সুপারভাইজার নামে একদল কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদের নিজ নিজ জেলাগুলোর আর্থিক অবস্থা, রায়তদের রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা, রায়তরা বিভিন্ন জেলায় কী ধরনের অধিকার উপভোগ করে এবং তাদের কাছে থেকে কী হারে রাজস্ব আদায় করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। নায়েব দেওয়ানের মতো সুপারভাইজাররাও মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্টের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। প্রত্যেক সুপারভাইজার তার জেলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলে এ ব্যবস্থা একটি অদক্ষ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুটি 'রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ' (Controlling Council of Revenue) গঠিত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারদারি বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি: ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর 'স বাংলার রাজস্বব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানিকে সরাসরি গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়। এ নির্দেশের ফলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নায়েব দেওয়ান মুহাম্মদ রেজা খানকে এবং বিহারের দেওয়ান সিতাব রায়কে পদচ্যুত করে। রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ তুলে দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজার কালেক্টর হিসেবে পরিচিত হয়। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে তদারকি করার জন্য ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বর্ধমান ও ঢাকায় মোট পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Council) গঠিত হয়।

এ পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ইজারাদারি (Farming System) বন্দোবস্ত চালু করেন। পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হতো বলে এ ব্যবস্থাকে পাঁচসালা বন্দোবস্ত (Five Year Settlement) নামেও অভিহিত করা হয়। এ ব্যবস্থায় জমির নিলাম ডাকা হয়। সর্বোচ্চ নিলামদারকে জমি পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। যেসব জমিদার নিলামে হেরে যায়, তারা জমিদারিও হারিয়ে ফেলে। অনেকে মর্যাদা রক্ষার্থে ও জেদের বশে সর্বোচ্চ নিলামে জমিদারি রক্ষা করে, কিন্তু বাস্তবে নিলামে ডাকা রাজস্ব সরকারের নিকট জমা দেওয়া সম্ভব হয় না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

আবার অধিকাংশ নিলামদারই ছিল কলকাতা শহরের লোক এবং গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অতিরিক্ত নিলাম ডাকার কারণে তাদের অনেকেই রাজস্বের প্রথম কিস্তির টাকা সরকারকে দিতে পারে না। পাঁচসালা বন্দোবস্তের কারণে সকল জমিদার ইজারাদার হিসেবে অভিহিত হয়। জমিদার, তালুকদার, ছোট জমিদার-সবাই ইজারাদার হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা জমিদার পরিচয়ের ধারাবাহিকতায় প্রথম ছেদ পড়ে। আবার পুরাতন জমিদারদের অনেকেই অতিরিক্ত নিলাম হওয়ার কারণে নিলাম ডাকতে ব্যর্থ হয়। এভাবে কিছু পুরাতন জমিদার বাদ যায় এবং নতুন জমিদার সৃষ্টি হয়। হেস্টিংসের এ ধরনের নয়া বন্দোবস্তের কুফল হিসেবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'পার্লামেন্টারি কমিটি অব সিক্রেসি' তার প্রতিবেদনে লিখেছিল কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই বেনিয়াদের সাথে জমির খাজনা থেকে আসা অর্থ ভাগ করে নিচ্ছে। কোম্পানির কিছু কর্মচারীও বেনামিতে জমিদারি বন্দোবস্ত নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব বাকি রাখতে থাকে। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপ ফ্রান্সিস অভিযোগ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও বেনিয়াদের মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করে যে, গ্রামবাংলার ভূমিব্যবস্থা তথা রাজস্ব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকগোষ্ঠী স্বার্থের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিটি জেলায় রায়তদের রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য আমিনী কমিশন গঠন করা হয়। এছাড়া লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ পাঠায় যে, ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে একটি বার্ষিক চুক্তি করতে হবে। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচসালা বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক জমিদারদের সাথে এক বছরের চুক্তি করা হয়। এক বছর মেয়াদি চুক্তির কারণে এ ব্যবস্থাকে বলা হতো একসালা বন্দোবস্ত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

এ বন্দোবস্ত অনুসারে-

১. ইজারাদারদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় জমিদারদের। জমিদারদের থেকে অন্য কেউ রাজস্ব বেশি দিতে চাইলেও জমিদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ইজারাদার পরিচয়ের পরিবর্তে পুরাতন জমিদার পরিচয় ফিরিয়ে আসে।

২. রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের গড় রাজস্বকে ধরা হয়।

৩. রাজস্ব বাকি পড়লে উৎপাদিত ফসল থেকে বকেয়া মিটিয়ে ফেলার সুযোগ দেওয়া হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভঃ লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈতশাসন

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্বব্যবস্থা

একসালা বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও রাজস্ব নির্ধারণে আগের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিই বহাল থাকে। বিগত তিন বছরে সরকারি কোষাগারে যে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়েছিল, তার নিট গড় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ হিসেবে জমিদারদের ওপর ধার্য করা হয়। এ ফলে কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানোর প্রবণতা থেকে যায়। এ ব্যবস্থাতেও বহু জমিদার তাদের নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। ভূমিরাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলো বাতিল করে একটি 'রাজস্ব কমিটি' (Committee of Revenue) গঠিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতি বাংলার রায়তদের খাজনার ভারে জর্জরিত করে তোলে। গ্রামীণ সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া আরো জটিল হয়ে উঠে। এ অভিজ্ঞতা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করে যে, কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে বাংলার জমিদারদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং এর অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল জমিদারদের আদিম ও ঐতিহ্যগত অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ পরিস্থিতিতে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হয়ে কলকাতায় আসেন এবং বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৩ ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

টপিক ০৩: ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। পরবর্তীতে এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। এ সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় গড়ে ওঠে। ফরায়েজি শব্দটি ফরজ থেকে এসেছে। ফরজ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ফরায়েজি বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ কার্যকর করা। অন্য কোনো আন্দোলনের সাথে চরিত্রগত মিল থাকলেও শুধু হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত এ আন্দোলনকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে একে ওহাবি আন্দোলন হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজি শরীয়তউল্লাহ।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলন

হাজি শরীয়তউল্লাহর পরিচিতি: হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার (বর্তমান জেলা) অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে তার পিতা আবদুল জলিল তালুকদার মারা যান। তার চাচার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। ১২ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় যান এবং সেখানে মাওলানা, এরপর তিনি হুগলি জেলার ফুরফুরায় আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে দুই বছর অবস্থান করার পর তিনি ১৭৯৯ সালে ১৮ বছর বয়সে পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশে মক্কায় গমন করেন। ১৭৯৯ হতে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সেখানে কুরআন ও হাদিসে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি ধর্মীয় সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গড়ে তোলেন একটি ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন। আন্দোলনরত অবস্থায় তিনি ১৮৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের পটভূমি

হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৮১৮ সালের দিকে মক্কা থেকে দেশে ফিরে এসে দেখেন, অধিকাংশ মুসলমানদের বিশ্বাসে কুফর ও শিরক মিশ্রিত রয়েছে। তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানরা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও সামাজিক উৎসবে বহু অমুসলিম ধর্মজাত আচার-অনুষ্ঠান পালন করছে। অনেকে জঘন্য বিদআত ও শিরকে লিপ্ত। মৃত ব্যক্তির কাছে ইহকাল বা পরকালের কোনো কিছুই চাওয়া যাবে না। মৃত ব্যক্তি কোনো পাপ করা বা কোনো সওয়াব হাসিল করা বা ইহজগতের কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না। সিজদা পাওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহপাক। অথচ তৎকালীন মুসলমানরা মৃত ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় সিজদা করত। গাজী-কালুর প্রশস্তি গাওয়া, পঞ্চপির, পিরবদর, খাজা-খিজিরের দোহাই দেওয়া, ভেলা ভাসানো, জারিগান গাওয়া, জন্মের সময় শটি পালন করা, মহররমে শোক পালন করা ইত্যাদি বিদআত হতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলামের নামে যেসব অনাচার, কুসংস্কার, শিরক ও বিদআত ঢুকেছে, সেগুলোই তিনি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পরবর্তীতে তার সংগঠনের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সদস্যদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। ফলে ফরায়েজি আন্দোলন একপর্যায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের পটভূমি

ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিচে ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো-

১. ইসলামের পাঁচটি মৌল আদর্শের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে তওহিদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ অনুশীলনের ওপর জোর দেওয়া।

২. সকল প্রকার শিরক ও বিদআত হতে ইসলামকে রক্ষা করা।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ব্রিটিশ শাসন হতে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৫. সমাজের নিম্নশ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

৬. কৃষক সমাজকে আত্মসচেতন ও উজ্জীবিত করা।

ফরায়েজি আন্দোলনে হাজি শরীয়তউল্লাহর অবদান

হাজি শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা। তার নেতৃত্বেই ফরায়েজি আন্দোলন গতি লাভকরে। তিনি প্রথমেই ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো দূর করার জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও মুস্তাহাবের পার্থক্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি বান্দার হক ও আল্লাহর হকের পার্থক্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও মুস্তাহাবকে তাদের গুরুত্ব অনুসারে আমল করার ওপর জোর দিয়েছেন।

ফরজ বাদ দিয়ে ওয়াজিব, আবার ওয়াজিব বাদ দিয়ে সুন্নতকে গুরুত্ব দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। আবার সুন্নত বাদ দিয়ে নফল নিয়ে টানাটানি করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। ফরজ নামাজ আদায় না করে শবে কদরের রাতে সুন্নত বা নফল নামাজ আদায়ে অধিক গুরুত্ব দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করেছেন, মুসলিম সমাজে বহু ফরজ অবহেলিত অথচ বহু নফল সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন পরহেজগার ও ধার্মিক মুমিন সকল ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত আদায় করার পর সুযোগ-সুবিধামতো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে নফল ও মুস্তাহাবের ওপর গুরুত্ব দেবেন। সকল ফরজ পালনের ওপর গুরুত্বারোপের কারণেই এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সকল ফরজ পালনের পরই তিনি শিরক ও বিদআতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিরক হলো মারাত্মক গুনাহ। শিরকে লিপ্ত হওয়ার পর তওবা করা জরুরি।

ফরায়েজি আন্দোলনে হাজি শরীয়তউল্লাহর অবদান

আল্লাহর ক্ষমতার সাথে, আল্লাহর মর্যাদার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক বা অংশীদার করা যাবে না। শিরক ও বিদআত থেকে বাঁচানোর জন্য হাজি শরীয়তউল্লাহ ব্যাপক প্রচারণা চালান। এরপর হাজি শরীয়তউল্লাহ তার অনুসারী বা সাগরেদদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল হারব' বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই সময় গরু জবাই করা নিষেধ ছিল এবং পূজা-পার্বণে মুসলমানদের কর দেওয়ার বিধান ছিল। তিনি মুসলমানদের গরু জবাই করতে আদেশ এবং পূজা-পার্বণে কর দিতে নিষেধ করেন। এতে হিন্দু জমিদারদের সাথে ফরায়েজি আন্দোলনকারীদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলেও তার বিচক্ষণতার কারণে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়নি।

ফরায়েজি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের চেষ্টা: হাজি শরীয়তউল্লাহর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনৈসলামিক কাজগুলো বন্ধ করা। ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল শিরক, বিদআত ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালানো। শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের কবরপূজা, পিরপূজা ইত্যাদি শিরকমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি মহানবি (সা.)-এর দুই দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হোসেনের শাহাদত দিবসে অস্বাভাবিক উন্মাদনাপূর্ণ শোক প্রকাশকে শরিয়ত বহির্ভূত বলে আখ্যা দেন। তিনি পির ও মুরিদের পরিবর্তে ওস্তাদ ও সাগরেদের সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরহীনভাবে পালনেরও পরামর্শ দেন শরীয়তউল্লাহ।

ইংরেজ শাসনবিরোধী অবস্থান: হাজি শরীয়তউল্লাহ ইংরেজ শাসনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সার্বিক মঙ্গল সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি ইংরেজ শাসনাধীনে থাকা এদেশকে 'দারুল হারব' (বিধর্মীর রাজ্য) বলে ঘোষণা করেন। এ. আর. মল্লিক বলেন, "তার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান শর্ত ছিল দুই ঈদের এবং শুক্রবারের নামাজ না পড়া।" ভারতবর্ষে মুসলমান শাসক না থাকায় হাজি শরীয়তউল্লাহ এখানকার মুসলমানদের জুমা ও ঈদের নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জুমা ও ঈদের নামাজ আদায় স্থগিত থাকবে।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

ফরায়েজিদের বিরোধিতা: হাজি শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলে অন্যান্য মতবাদের অনুসারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ হন। শরীয়তউল্লাহ পির মুরিদ ব্যবসার বিরোধিতা করায় সমকালীন মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৈনপুরি তার বিরোধিতা করেন। তিনি ফতোয়া দেন, ফরায়েজিরা ইসলাম ধর্ম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে নেমেছে। মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি এদেশকে 'দারুল আমান' নিরাপত্তার দেশ বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইংরেজ শাসকদের সাথে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন।

ফরায়েজি ভ্রাতৃত্ববোধ : ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল এর অনুসারীদের ভ্রাতৃত্ববোধ। ফরায়েজিরা সৎ পথে উপার্জন, নৈতিক জীবন ও শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি অভিন্ন মূল্যবোধের প্রতি অনুগত ছিলেন। শরীয়তউল্লাহ পরিশ্রম করে সৎপথে অর্থ উপার্জনের আদর্শ তুলে ধরছেন।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

ফরায়েজিদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব পেশার মানুষকেই তিনি শ্রমিক বলে সম্মান জানান। এসব আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়ে ফরায়েজিদের মধ্যে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন: হাজি শরীয়তউল্লাহ সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করেন পরবর্তীকালে তার পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের ফরায়েজি প্রভাবিত অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত সমান্তরাল আরেকটি সরকারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক ফরায়েজি গ্রামের অধিবাসীরা একজন নেতা নির্বাচিত করত যাকে বলা হতো 'গাঁও খলিফা'। আবার গাঁও খলিফারা মিলিত হয়ে প্রত্যেক থানার জন্য একজন 'পির খলিফা' নির্বাচিত করতেন।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

স্থানীয় জমিদারদের সাথে বিরোধ: বাংলার অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররা বিভিন্ন পূজার সময় মুসলমান প্রজাদেরও উৎসব কর দিতে বাধ্য করতেন। জমিদারদের কেউ কেউ মুসলমান প্রজাদের দাড়ি রাখার জন্যও কর আরোপ করেন। হাজি শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের এসব অবৈধ কর না দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তার সংস্কার কর্মকাণ্ডকে হিন্দু জমিদার ও এক শ্রেণির কায়েমি স্বার্থবাদী মুসলমান সহ্য করতে পারেনি। তারা শরীয়তউল্লাহর চরম বিরোধিতা করে। এ প্রেক্ষাপটে হাজি শরিয়তউল্লাহ অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে তার অনুসারীদের রক্ষা করার জন্য একটি লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। জমিদাররা নানা অজুহাতে ফরায়েজিদের ওপর অত্যাচার করতেই থাকে। ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে তারা অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরদের সাথে হাত মেলায়। এছাড়া ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিচারকমণ্ডলীকে ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয়।

ফরায়েজি আন্দোলনে দুদু মিয়ার অবদান

১৮৪০ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন হাজি শরীয়তউল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি পিতার নিকট কুরআন ও হাদিস শিক্ষালাভকরেন। অল্প বয়সেই তিনি হজব্রত পালন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম সমাজে ফরায়েজি আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। দুদু মিয়ার অসাধারণ দক্ষতাবলে ফরায়েজি আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। দুদু মিয়া বিশ্বাস করতেন, এ পৃথিবীর মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। তাই ভূসম্পত্তিসহ সকল প্রকার পার্থিব সম্পত্তি ও সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি হিন্দু জমিদার কর্তৃক প্রবর্তিত সকল প্রকার খাজনা ও করকে বেআইনি বলে ঘোষণা দেন। নিপীড়িত, নির্যাতিত, রায়ত ও চাষিদেরকে রক্ষার জন্য তিনি অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ফরায়েজি আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ফরায়েজি আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনেন। তিনি সম্প্রসারিত এলাকাকে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করেন এবং বাংলায় পুরানো ঐতিহ্যবাহী সংগঠন পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

ফরায়েজি আন্দোলনে দুদু মিয়ার অবদান

লাঠিয়াল বাহিনী গঠন: ফরায়েজি আন্দোলনকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য দুদু মিয়াকে হিন্দু জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের বিরাগভাজন হতে হয়। অনেক সময় তারা ফরায়েজি আন্দোলন সমর্থনকারীদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে। এসব বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনে লাঠিয়ালি বাহিনী গড়ে তোলা হয়। দুদু মিয়া লাঠিয়াল বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে পাঁচরে ডানলপের নীলকুঠির গোমস্তা মাড়ওয়ারি হিন্দু কালীপ্রসাদ কাজিলাল পাঁচরের হিন্দু বাবুদের সাথে নিয়ে ৭০০ বা ৮০০ লোক নিয়ে বাহাদুরপুরে দুদু মিয়ার বাড়ি আক্রমণ করেন। তারা মানুষকে হত্যা, লুটতরাজ এবং বাড়িঘর ভাংচুর করে। ঘটনাটি পুলিশকে জানালে হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তা মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে দুদু মিয়ার লোকজনকেই বিচারার্থে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রেরণ করেন। দায়রা আদালত দুদু মিয়া ও তার ৪০ জন অনুসারীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়। পরে মামলাটি কলকাতার সদর নিজামত আদালতে প্রেরণ করা হলে আদালত শুনানি শেষে তাদের সবাইকে খালাস দিয়ে দেয়। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলনে দুদু মিয়ার অবদান

দুদু মিয়ার পরবর্তী নেতৃত্ব: ১৮৬২ হতে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত দুদু মিয়ার পুত্র নয়া মিয়া এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৮৪ সাল হতে দুদু মিয়ার অপর পুত্র সৈয়দ উদ্দিন আহমদ ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ব্রিটিশ সরকার সৈয়দ উদ্দীনকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে তিনি খাজা সলিমুল্লাহকে সমর্থন করেন। ১৯০৬ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। খান বাহাদুর সৈয়দ উদ্দিনের পর তার বড় ছেলে রশিদ উদ্দিন আহমদ ওরফে বাদশাহ মিয়া ফরায়েজি সংগঠনকে ধরে রাখেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে এ সংগঠন ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। এরপর তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি নারায়ণগঞ্জে ফরায়েজিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে পাকিস্তানকে 'দারুল ইসলাম' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং অনুসারীদের জুমা ও ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব

ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম জাগরণে ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ফরায়েজি আন্দোলন দ্রুততার সাথে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাসমূহে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের মনে আলোকবর্তিকা ও আলোর দিশারি হিসেবে কাজ করেছিল।

ফরায়েজি মতবাদসমূহ: হাজি শরীয়তউল্লাহর অনুসারীদের ফরায়েজি বলা হতো। তারা সকলেই ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। ফরায়েজিগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনে কয়েকটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন-

১. তাওবা অর্থাৎ আত্মার পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া;
২. ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ কঠোরভাবে পালন করা;
৩. কুরআন নির্দেশিত তওহিদ বা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদ;
৪. ভারতবর্ষ 'দারুল হারব' বিধায় এখানে জুমা ও ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং
৫. কুরআন ও সুন্নাহবহির্ভূত সকল লোকাচার ও অনুষ্ঠানকে 'বিদআত' বলে পরিহার করা।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব

সংগঠন: ফরায়েজিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দুদু মিয়ার দুটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। যেমন- ১. স্থানীয় জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার হতে ফরায়েজি কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করা; ২. জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খিলাফত কাঠামো: খলিফা (আধ্যাত্মিক প্রধান) তত্ত্বাবধায়ক খলিফা (সার্কেল প্রধান) গাঁও বা ওয়ার্ড খলিফা। তত্ত্বাবধায়ক ও ওয়ার্ড খলিফা ছিল অসংখ্য। তবে একজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফার অধীনে সাধারণত দশ বা তার কিছু বেশি ওয়ার্ড খলিফা থাকত। আবার একজন ওয়ার্ড খলিফার অধীনে সাধারণত ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবার থাকত। ইংরেজ জেমস ওয়াইজের মতে, পূর্ববাংলার পঞ্চায়েতগুলো জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ফরায়েজি গ্রামগুলোতে সংঘটিত হিংসাত্মক বা মারামারির কোনো ঘটনা কদাচিৎ নিয়মিত আদালত পর্যন্ত গড়াত।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

উপমহাদেশের জনসাধারণকে নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে শহিদ তিতুমীরের চিন্তা ও আদর্শ অপরিসীম প্রভাব রেখেছিল। ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের হাত হতে রাজ ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের ফলে রাজস্ব ও জমিদারি ব্যবস্থায় ভারসাম্য নষ্ট হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্তে ইজারাদার প্রথার মাধ্যমে জমিদারি বন্দোবস্ত দেন। এর ফলে নতুন সামাজিক স্তরবিন্যাসে হিন্দুরা এগিয়ে যায়। নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু করেন। এর ফলে হিন্দুরা আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে। এরূপ বাস্তবতা ও পটভূমিতে শহিদ তিতুমীর মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন।

তিতুমীরের পরিচয়: আসল নাম মীর নিসার আলী কিন্তু তিনি তিতুমীর নামেই অধিক পরিচিত। ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মীর হাসান আলী এবং মাতা আবেদা রুকাইয়া খাতুন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। মুন্সী লাল মিঞা, হাফেজ নিয়ামত উল্লাহ এবং রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, শরিয়ত ও তরিকত সম্পর্কে এবং বাংলা ও অঙ্ক বিষয়ে শিক্ষা লাভকরেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনে হাফেজ হন।

ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

মীর নিসার আলী তিতুমীর

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

তিতুমীরের উদ্দেশ্য: শহিদ তিতুমীর মুসলমানদের ইমান, আমল, পবিত্র কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী পরিচালনার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হন। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হিন্দু, জমিদার, নীলকর ও ইংরেজরা তার প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে তার আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। ধর্ম সংস্কারক ও প্রচারকারী হিসেবে শহিদ তিতুমীরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে অত্যাচারী জমিদারগণ তার প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। শহিদ তিতুমীর ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি কিছু সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। হিন্দু জমিদারগণ সেই সময় বহু প্রকারের কর আদায় করত। পূজা-পার্বণেও তারা মুসলমানদের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করত। সবচেয়ে বিরক্তিকর কর ছিল দাড়ি কর। দাড়ি রাখার জন্য মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে মাথা প্রতি ২/২ টাকা কর দিতে হতো। গুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ ও পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় দাড়ি কর নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেন। তিতুমীর এসব কর না দেওয়ার জন্য অনুসারীদের নির্দেশ দেন। ফলে হিন্দু জমিদারদের সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

শহিদ তিতুমীরের সংগ্রাম: কৃষক সমাজে তিতুমীরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন হিন্দু জমিদারেরা তিতুমীরের শক্তি নির্মূলের চেষ্টা করে। পূর্ণিয়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় প্রমুখ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু জমিদারেরা মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর কর ধার্য করে। এতে সাধারণ মুসলিম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। শহিদ তিতুমীর দাড়ি কর পরিশোধ করতে নিষেধ করেন। দাড়ি করের বিপক্ষে তিনি জনমত গঠন শুরু করেন। পূর্ণিয়ার জমিদার রামনারায়ণ ও পুড়ার জমিদার দাড়ি কর আদায়ের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নেন। ফলে দু' পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেন। পূর্ণিয়ার জমিদার জোরপূর্বক দাড়ি কর আদায় করতে ৫০০ লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ প্রেরণ করেন। তারা মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। মুসলমানদের মারধর করে এবং তাদের ধনসম্পদ লুটতরাজ করে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রজারা থানায় দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীর নিকট নালিশ করে। রাম রাম চক্রবর্তী অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। ক্ষতিগ্রস্ত প্রজারা এবার বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দাখিল করে কিন্তু প্রজারা আবার হতাশ হয়। হিন্দু জমিদাররা ইংরেজ সরকারকে কৃষক বিদ্রোহ দমন বলে তাদের নিজেদের পক্ষে সাফাই করে। শহিদ তিতুমীর ও তার অনুসারীরা বুঝতে পারে, ইংরেজ সরকার জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণেই অধিক আগ্রহী। তাই তিতুমীর বাহিনী নিজেরাই প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

সংঘর্ষ: হিন্দু জমিদারগণ দাড়ি কর আদায়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেন। লর্ডঘাট নামক স্থানে তিতুমীরের বাহিনীর সাথে নওহাটার জমিদার দেবনাথ রায়ের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। এরপর জমিদারপক্ষের সাথে তিতুমীর বাহিনীর আরও দুটি যুদ্ধ হয়। দুটি যুদ্ধেই তিতুমীর বাহিনী বিজয়ী হয়। পর পর দুটি যুদ্ধে তিতুমীরের বাহিনী বিজয়ী হওয়ায় তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তাদের আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে যায়, তারা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে। পরাজিত জমিদারেরা নীলকরদের বোঝাতে সক্ষম হয়, তিতুমীরের সশস্ত্র সংগ্রাম ইংরেজ উৎখাতের সংগ্রাম। সে সময় তিতুমীরের লোকবল কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরাজিত জমিদারদের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির নীলকর ডেভিস তিতুমীরকে আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয়। এবার হিন্দু জমিদার ও নীলকররা একপক্ষে চলে আসেন। তারা ইংরেজ সরকারকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইংরেজ সরকার তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১২৫ জন পুলিশ নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ায় হাজির হন। পুলিশ বাহিনীর সাথে তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

সংঘর্ষে পুলিশ বাহিনী পরাজিত হয়। ইংরেজপক্ষের কয়েকজন সিপাহি ও বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এরপর নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২৫০ জন পুলিশ ও কয়েকটি হাতি নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হন। সাথে জেলার নীলকর সাহেবেরাও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিতুমীরের বাহিনীতে প্রায় ১ হাজার লোক ঢাল, তলোয়ার, তীর, লাঠি, বর্শা, সুড়কি ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল। তিতুমীরের বাহিনী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। ম্যাজিস্ট্রেট তার দল নিয়ে পালিয়ে জীবন বাঁচান। তারপর ইংরেজপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার সুন্দরবন ঘুরে কলকাতায় পৌছে সরকারকে পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

ইংরেজ সরকার পুরো ব্যাপারটিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা বলে মনে করেন।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

বাঁশের কেল্লা: বাঁশের কেল্লা একটি ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নিদর্শন। সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে নারিকেলবাড়িয়ায় একটি নিয়মিত ও শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে লে. কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে দেশি পদাতিক বাহিনীর ১১টি রেজিমেন্ট, কয়েকটি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদল এবং দেহরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা নারিকেলবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা দেয়। অপরদিকে, তিতুমীর তার শিষ্য মুইজউদ্দিনের নারিকেলবাড়িয়ার গ্রামের বাড়িতে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

১৭ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ইংরেজ বাহিনীর সাথে মিলিত হন। আলেকজান্ডার ও ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ড ১৮ নভেম্বর স্থানটি জরিপ করেন। ১৯ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। তিতুমীর ও তার প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম বীরের মতো লড়াই করেন। সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তিতুমীর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এতে তিতুমীরসহ ৫০ জন অনুসারী শাহাদৎ বরণ করেন। প্রায় ৩০ জন আহত এবং ২৫০ জন বন্দি হন। কলকাতায় তিতুমীরের অনুসারীদের একতরফা বিচার করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে তিতুমীর কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

আন্দোলনের স্বরূপ: তিতুমীরের এ আন্দোলনের স্বরূপ নির্ধারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, এটি সংস্কার আন্দোলন, কারও মতে প্রজা বিদ্রোহ, আবার কারও মতে এটি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ আন্দোলনটিতে তিনটি উপাদান সমানভাবে কাজ করেছে। প্রথমদিকে তিনি মুসলিম সমাজ হতে সকল প্রকার শিরক, কুফর ও বিদআত দূর করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় ভীত থেকেই তার নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় তিনি কৃষক-প্রজার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এজন্য একে প্রজা বিদ্রোহ বলা যায়। তিনি জমিদারদের ধর্মকে না দেখে জমিদারের অত্যাচারকে, অন্যায় করারোপকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তার আন্দোলন কোনো ধর্মের বিপক্ষে ছিল না। এখানে যুদ্ধ হয়েছে প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে। হিন্দু ও মুসলিম পরিচয়ে যুদ্ধ হয়নি। ঘটনাচক্রে এসব জমিদারগণ ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী (সনাতন ধর্মাবলম্বী) এজন্য একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যাবে না।

তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৭৮২-১৮৩১)

হিন্দু জমিদারগণ তাঁকে সুকৌশলে ইংরেজদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। হিন্দু জমিদারগণ যখন অন্যায়ভাবে আরোপিত কর আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তিতুমীর কৃষক প্রজাদের প্রতিনিধি হিসেবে সামনে দাঁড়িয়েছেন, তখন তিতুমীরকে ইংরেজদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দু জমিদারগণ বুঝিয়েছেন যে, তিতুমীর ইংরেজদের উৎখাতের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। আবার অপরদিক বিবেচনায় বলা যায়, ইংরেজ সরকার ইচ্ছা করে তিতুমীরকে গুরুত্ব না দিয়ে অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের গুরুত্ব দিয়েছে। এতে তিতুমীর ও ইংরেজদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৪ ১৮৫৭ সালের বিপ্লব

টপিক ০৪: ১৮৫৭ সালের বিপ্লব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৮৫৭ সালের বিপ্লব

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকে সাধারণত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ একে সিপাহি বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। অনেকে একে 'জাতীয় সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে আবার একে 'মহাবিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ একশ বছর ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এসবই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছে।

১৮৫৭ সালের বিপ্লব

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কারণসমূহ

হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা, খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রবণতা, শিক্ষানীতির পরিবর্তন করা, লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করা, জমিদারি নিলাম করা, স্ট্যাম্প প্রথার প্রবর্তন করা ইত্যাদিকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের মৌলিক কারণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এছাড়া জনসাধারণের দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের উপেক্ষার মনোভাব, দায়িত্ব পালনে সরকারের উদাসীনতা, সৈন্যবিভাগে অবস্থান ও বিশৃঙ্খলা হিন্দু-মুসলিম সৈন্য সমন্বয়ে প্লাটুন গঠন ইত্যাদি ছিল এ বিপ্লবের অন্যতম কারণ। এ কারণগুলোকে নিচের কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কারণসমূহ

রাজনৈতিক কারণ: পলাশী যুদ্ধের পর হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। স্বত্ববিলোপ নীতির কারণে দত্তকপুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়। এ নীতি প্রয়োগ করে কর্নাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্র এবং পেশওয়ার দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্রিটিশদের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও স্বত্ববিলোপ নীতির কারণে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন। নাগপুর ও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে সকল আসবাবপত্রাদি, মণিমুক্তা অলংকারাদি এমনকি হাতি, ঘোড়া পর্যন্ত লুণ্ঠন করা হয়েছিল। লুণ্ঠিত মালামালের কতকগুলো কলকাতায় প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় করা হয়েছিল। সিন্ধুর আমিরদের প্রতি ইংরেজদের অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং ডালহৌসি কর্তৃক মুঘল সম্রাটের উপাধি বিলুপ্তি ইত্যাদি উদ্যোগ ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষুব্ধ ও চরম উত্তেজিত করে তোলে। ইংরেজ কর্তৃক গৃহীত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে মহীশূর, হায়দারাবাদ এবং মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ একটি ত্রিশক্তি মিত্রসংঘ গঠন করেন। কিন্তু হেস্টিংসের কূটনীতির ফলে এ মিত্রশক্তি সফল হতে পারেনি। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম সকলের মধ্যে ভীতি, বিদ্বেষভাব এবং ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব কাজ করেছিল।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কারণসমূহ

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ: সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপ বেআইনি ঘোষণা, হিন্দু ধর্মত্যাগীদের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার প্রথাকে নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কার এবং দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, ইংরেজরা এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর। ভারতীয়দের এ ভীতি রাজনৈতিক আশঙ্কার সাথে যুক্ত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গ, তাদের অনুগৃহীত পণ্ডিত ও মৌলভীগণ বিভিন্ন শ্রেণি, পেশাদার কর্মচারীদের মধ্যে যে সামাজিক কাঠামো ছিল ইংরেজদের বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে তা ভেঙে যায়। এতে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

শাসনসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কারণ: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতীয় শাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্বনীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কারণসমূহ

সামরিক কারণ: ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম একটি কারণ। যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন সামরিক বাহিনীর অসন্তোষই বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করে। ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে পদবি, বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল।

প্রত্যক্ষ কারণ: বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু জাতির মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে হিন্দুদের সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এ রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। ভারতীয় সৈন্যদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, এ টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে ধর্মনাশের কথা ভেবে উভয় জাতির সৈন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

১৮৫৭ সালের বিপ্লব

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

২৯ মার্চ ১৮৫৭ সালে কলকাতার সন্নিকটস্থ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে নামক জনৈক সিপাহি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ দ্রুত পিরোজপুর, মুজাফফর নগর, পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা, মথুরা, লক্ষ্মৌ, মোরাদাবাদ, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ফতেপুর, ফতেহগড়, বাংলা, বিহার প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহিগণ মুঘল বংশের দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে 'একতার প্রতীক' (Symbol of Unity) হিসেবে গ্রহণ করেন। স্থানে স্থানে কিছু জনসাধারণ, সম্পত্তিচ্যুত তালুকদার, নির্যাতিত কৃষক এ বিদ্রোহে যোগদান করে। কানপুরের নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লাহ, জগদীশপুরের রাজপুত দলপতি কুনওয়ার সিং, ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ উল্লাহ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ এ বিদ্রোহে ব্যাপক অবদান রাখেন। ইংরেজরা চরম নৃশংসতার মধ্য দিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করে। চার মাস এ বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের মধ্যে এ বিদ্রোহ দমন করা হলে ভারতে ইংরেজদের স্থায়ী কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বিপ্লব একাধিক কারণে একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সূচনা করে। এ বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। এ বিদ্রোহের ফলাফল নিম্নরূপ-

কোম্পানির শাসনের অবসান: এ বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কোম্পানির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ভারতের জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনা করে ২ আগস্ট ১৯৫৮ সালে এক ঘোষণা দ্বারা ইংল্যান্ডের কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তিনি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি নামে পরিচিত হন।

মুসলিম জাতির ওপর ইংরেজ সরকারের নির্যাতন: ১৮৫৭ সালের বিপ্লবোত্তরকালে ব্রিটিশদের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের দরুন মুসলিম জাতির জানমাল, মানসম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই হয় বিপর্যস্ত ও প্রায় বিধ্বস্ত। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নিকট হতে বিদ্রোহের সব কাগজপত্র ও হুকুমনামা নিয়ে নেওয়া হয়। ফৌজি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। এরপর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল

ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার: ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদে নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৬১ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (ICS) আইন পাস করে। দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি, দত্তক পুত্র গ্রহণের স্বীকৃতি, ধর্মরক্ষা এবং কুখ্যাত স্বত্ববিলোপ নীতি চিরতরে রহিত করা হয়। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের পরিবর্তন করে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। নতুন আইনসভায় পাতিয়ালার মহারাজা, বেনারসের রাজা ও স্যার দীনকর রাওকে বেসরকারি সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

সামরিক সংস্কার: ভারতীয় সামরিক বিভাগকে ঢেলে সাজানো হয়। 'ভাগ কর এবং শাসন কর' (Divide and Rule) নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রেসিডেন্সি সেনাবাহিনীকে আলাদা রাখা হয়, ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়, গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং সীমান্তরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল

মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে জড়িত থাকার কারণে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে অন্যতম অপরাধী হিসেবে মিয়ানমারের রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ৮৩ বছরের বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল, দুই শাহজাদা, শাহজাদী এবং অন্য আত্মীয় ও 'ভৃত্যদের নিয়ে ইংরেজ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী দিল্লি ত্যাগ করে। ৯ ডিসেম্বর জাহাজ মিয়ানমারের বেঙ্গুনে পৌছে। ব্রিটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিসের বাসভবনের ছোট গ্যারেজে বাদশাহকে থাকতে দেওয়া হয়। পাটের দড়ির খাটিয়াতে সম্রাটকে ঘুমাতে দেওয়া হয়। এক সময় সম্রাট পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর শুক্রবার ভোর ৫টায় সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে রেঙ্গুনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সম্রাটের প্রিয়তমা স্ত্রী জিনাত মহল ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র ও পৌত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৮৭৬ সালের রাজকীয় অধিকার আইনে ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' আখ্যা দেওয়া হয়। এভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল

নবযুগের সূচনা: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং একটি নতুন যুগের আবির্ভাব হয়। ইংরেজরা রাজ্যবিস্তার নয়, রাজ্যটাকেই কেবল টিকিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করে। তারা অর্থনৈতিক শোষণের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজরা এ মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজকে তার আজ্ঞাবহ করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরিশেষে তা সম্ভব হয়নি। ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৫ সংস্কার আন্দোলনঃ

টপিক ০৫: সংস্কার আন্দোলনঃ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংস্কার আন্দোলনঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারে মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হন হাজি মুহাম্মদ মোহসিন, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী। তারা ছিলেন মহান আদর্শ ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী।

সংস্কার আন্দোলনঃ

হাজি মুহাম্মদ মোহসিন

পরিচয়: হাজি মুহাম্মদ মোহসিন ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম হাজি ফয়জুল্লাহ এবং মাতার নাম জয়নাব খানম। তার বাবা বিত্তশালী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তার বাবা ছিলেন একজন ইরানি ও জায়গিরদার। ইরানি ব্যবসায়ী আগা মোতাহার হোসেনের সাথে তার মায়ের প্রথম বিবাহ হয়। মুন্নুজান খানম ছিলেন এ পক্ষের একমাত্র কন্যা। মুন্নুজান পিতা আগা মোতাহার হোসেনের পক্ষ হতে বিপুল সম্পত্তি লাভ করেন। তার বাবা হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় বিস্তীর্ণ জায়গির লাভ করেন। মুহাম্মদ মোহসিন গৃহ শিক্ষকের নিকট পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। তিনি ইরান, ইরাক, আরব, তুরস্কসহ বহুদেশ ভ্রমণ করেন। আরবে অবস্থানকালে তিনি হজ পালন করেন। ইতোমধ্যে হুগলির নায়েব ফৌজদার মির্জা সালাহউদ্দিনের সঙ্গে তার বোন মুন্নুজান খানমের বিবাহ হয়। হাজি মুহাম্মদ মোহসিন দীর্ঘ ২৭ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সফরে থাকাকালে তার . মা-বাবা ইন্তেকাল করে। অল্প বয়সে বোন মুন্নুজান বিধবা হন। ১৮০৩ সালে মুন্নুজান ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক ছিলেন।

হাজি মুহাম্মদ মোহসিন পৈত্রিক ও বোনের সূত্রে বিপুল সম্পদের অধিকারী হন।

সংস্কার আন্দোলনঃ

হাজি মুহাম্মদ মোহসিন

হাজি মুহাম্মদ মোহসিন

সংস্কার আন্দোলনঃ

হাজি মুহাম্মদ মোহসিন

আত্মত্যাগ: হাজি মুহাম্মদ মোহসিন ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও বিদ্বান। তিনি তার সম্পদ ও সম্পত্তি আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি ১৮০৬ সালে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং দুজন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করেন। তিনি তার সম্পত্তিকে ৯টি অংশে বিভক্ত করেন। ইসলামের সেবার জন্য তিনটি; পেনশন, বৃত্তি এবং দাতব্য কাজে ব্যয়ের জন্য চারটি অংশ রাখা হয়। বাকি দুটি অংশ মুতাওয়াল্লিদের বেতন-ভাতাদি দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৮১৮ সালে সরকার মোহসিন ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। মোহসিন ফান্ড হতে দালানকোঠা, আবাসস্থল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, সমাধিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। গরিব, এতিম, অসহায় ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা অর্জনের জন্য মোহসিন ফান্ড হতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। হাজি মুহাম্মদ মোহসিন ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, চিরকুমার ও মহান জনহিতৈষী ব্যক্তি। জনকল্যাণে, আর্তমানবতার সেবায় তার আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংস্কার আন্দোলনঃ

নওয়াব আবদুল লতিফ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবাব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানদের জীবনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলার মুসলিমগণ যখন হতাশাগ্রস্ত ও অসংগঠিত তখন তিনি মুসলমানদের নবজাগরণের অন্যতম স্থপতি হিসেবে আবির্ভূত হন।

পরিচয়: নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে বর্তমান ফরিদপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ফকির মাহমুদ ছিলেন ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং কলকাতার সদল দেওয়ানি আদালতের একজন আইনজীবী। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবদুল লতিফকে আরবি, ফারসি, উর্দুর সঙ্গে ইংরেজিতে পারদর্শী করে তোলা হয়।

তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন শেষ করে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় আরবি ও ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৭ সালে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। তিনি ১৮৮৪ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০ সালে নবাব ও ১৮৮৭ সালে নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই। তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান ছিল অসামান্য।

সংস্কার আন্দোলনঃ

নওয়াব আবদুল লতিফ

আত্মত্যাগ: নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রধান অবদান ছিল শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কারণে মুসলিম সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। মুসলিম সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। মুসলিমগণ ইংরেজ শাসন মেনে নিয়ে নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট হোক, এটিই ছিল তার প্রধান চিন্তা। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি দ্বিবিধ নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমত, ব্রিটিশদের নতুন শাসন পদ্ধতির সুফল ভোগ করার জন্য মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা এবং দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভীব সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করা। আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান করে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। চাকরি-বাকরিসহ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের উপযোগী হিসেবে মুসলমানদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গড়ে তোলেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং শিক্ষিত মুসলিম, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে পারস্পরিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের

সংস্কার আন্দোলনঃ

নওয়াব আবদুল লতিফ

নওয়াব আবদুল লতিফ

সংস্কার আন্দোলনঃ

নওয়াব আবদুল লতিফ

উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নবাব আবদুল লতিফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৮৭৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলিম ছাত্রদের সর্বপ্রথম একাডেমিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কলকাতার মুসলিম অঞ্চলে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও হুগলি কলেজকে সরকারিকরণে তিনি জোর প্রচেষ্টা চালান এবং সফল হন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কলকাতা মাদ্রাসায়-ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলা এবং উর্দু ও বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তিনি হুগলি মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হুগলি মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তার উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ২৮,০০০ টাকার বৃত্তি তহবিল গঠিত হয়। তারই আন্তরিক প্রচেষ্টায় মোহসিন ট্রাস্টের অর্থ গরিব ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্যয়ের সুব্যবস্থা করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তার এসব অবদান বাংলার মুসলমানদের চেতনাকে জাগ্রত করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ ও মুসলমানদের সম্পর্কোন্নয়নে তিনি এক সেতুবন্ধন রচনা করেন।

সংস্কার আন্দোলনঃ

নওয়াব আবদুল লতিফ

এতে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষ অনেকটা লাঘব হয় এবং ইংরেজদের প্রতিও মুসলমানদের ক্ষোভ অনেকাংশে প্রশমিত হয়। আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাংলার মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি মেহনতি ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণেও তার অবদান লক্ষ করা যায়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছিলেন এবং নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও মেহনতি, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে আবদুল লতিফের অনুরোধে প্রখ্যাত জৈনপুরী মাওলানা কেরামত আলী ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' হিসেবে ফতোয়া দেন। তিনি যুক্তি দেন, যেহেতু ভারতে মুসলিমগণ নিজ ধর্ম বিনা বাধায় পালন করতে পারে, সে কারণে এদেশ 'দার-উল-ইসলাম"। ১৮৬৭ সালে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতি এবং আলীপুরে বয়স্ক অপরাধী কেন্দ্র স্থাপনেও তার অবদান ছিল। তার এসব সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড মুসলিম সমাজকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের আইনগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে। সোসাইটি মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন। পরিশেষে বলা যায়, নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন মহান আদর্শ ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী। ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারে তার অবদান অপরিসীম।

সংস্কার আন্দোলনঃ

সৈয়দ আমির আলী

সৈয়দ আমির আলী তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনার অধিকারী ছিলেন। মুসলিম সমাজের অবক্ষয় লক্ষ করে তিনি নিজেকে ইসলামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলেন। ৬ এপ্রিল ১৮৪৯ সালে সৈয়দ আমীর আলী হুগলি জেলার চুচুড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সৈয়দ সা'দত আলী ছিলেন অযোধ্যার নবাবের অধীনে উচ্চপদের রাজকর্মচারী। ১৮৬৯ সালে তিনি হুগলি কলেজ হতে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। অল্পদিন পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে গমন করেন।

১৮৭৩ সালে বিলেতের Inner Temple থেকে তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৭৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন। কয়েক বছর অধ্যাপনার পর তাঁকে ১৮৭৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালে তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করে আইন ব্যবসায় ফিরে আসেন।

সংস্কার আন্দোলনঃ

সৈয়দ আমির আলী

সরকার তাঁকে প্রাদেশিক আইনসভার (Bengal Legistative Council) সদস্য মনোনীত করেন। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৮৩ সালে ভাইসরয় লর্ড রিপন তাঁকে Imperial Legistative Council-এর সদস্য পদে মনোনয়ন দান করেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নির্বাচিত হন। পরে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে তিনি ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালত Privy Council-এর সদস্যপদে নিযুক্ত হন। এ পদে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়। তিনি ইসলাম ও আইনবিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, এথিকস অভ ইসলাম, মোহামেডান ল' ইত্যাদি।

সৈয়দ আমীর আলী

সংস্কার আন্দোলনঃ

সৈয়দ আমির আলী

আত্মত্যাগ: ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কারণে মুসলিম জাতি শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দীনহীনভাবে কালাতিপাত করতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুসলমানদের দুরবস্থা তুলে ধরার মতো প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। মুসলিম জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পনেরো বছর পরে ১২ মে ১৮৭৮ সালে কলকাতার ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাটনার নবাব আমীর আলী খান বাহাদুর সভাপতি, সৈয়দ আমীর হোসেন সহসভাপতি এবং সৈয়দ আমীর আলী সম্পাদক নির্বাচিত হন।' ১৮৮০-৮১ সালে কয়েকটি শাখা খোলা হলে এর নামের আগে 'সেন্ট্রাল' শব্দ যুক্ত হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ-

১. ন্যায়সংগত ও আইনসম্মত উপায়ে ভারতের মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করা;

২. ব্রিটিশ রাজের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক ও আনুগত্য বজায় রাখা;

৩. ইসলামের অতীতের মহান ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বর্তমানের প্রগতিশীল ধারাগুলোর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং

৪. নৈতিক চেতনার পুনঃবিকাশ এবং ন্যায় ও যুক্তিসংগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সমর্থন লাভের দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

সংস্কার আন্দোলনঃ

সৈয়দ আমির আলী

সৈয়দ আমীর আলীর অবদান মুসলমানদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আলাদা সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন। অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে মুসলমানদের পক্ষে ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা অর্জন সম্ভব ছিল না। এজন্য তিনি একাধারে মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজি শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা করা, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলিম শিক্ষক ও ইন্সপেক্টর নিয়োগের দাবি করেন। হাজি মুহাম্মদ মোহসিন ফান্ডের ও অন্যান্য ওয়াক্ত সম্পত্তির টাকা শুধু মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি কলকাতা ও মফসলে, সরকারি উচ্চপদে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টানদের সংখ্যা কীরূপ, তার একটি তালিকা ব্রিটিশ সরকারের নিকট জমা দেন। বিহারে নাগরী লিপির পরিবর্তে আরবি লিপি এবং আদালতের ভাষা উর্দু করার পক্ষে চেষ্টা করেন। তিনি তার স্মারকপত্রের উপসংহারে উল্লেখ করেন, মুসলমানদের দুরবস্থা কেবল মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর নয়, ব্রিটিশ স্বার্থেরও পরিপন্থি। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের সরবরাহ করা স্মারকপত্রের নকল ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা বিভাগ, সভা-সমিতি ও হান্টার কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। এদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই লর্ড ডাফরিনের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৬ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

টপিক ০৬: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এর পক্ষে এবং কংগ্রেস এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন (১৮৯৮-১৯০৫ খ্রি.) ভাইসরয় থাকাকালীন সময়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এ বিভক্তি উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে সুপরিচিত। এ বিভক্তির পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলাপ্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। এর রাজধানী ছিল কলকাতা। এ প্রদেশের আয়তন ছিল প্রায় দু'লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্রান্ট ফোর্ট উইলিয়াম বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসিও একই প্রস্তাব করেন। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সন্তোষজনকভাবে মোকাবিলা করতে সরকার ব্যর্থ হয়। এ সময়ে গঠিত একটি কমিটি বাংলা প্রদেশ বিভক্তির সুপারিশ করে। প্রায় একই সময়ে বাংলার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল ১৮৭২ সালে প্রশাসনিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বাংলাকে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন। ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াসহ চীফ কমিশনারভুক্ত করে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়। ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা,

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাগুলোকে আসামের কাছে হস্তান্তরের সুপারিশ করেন। সীমানা পুনর্বিন্যাসের সুপারিশগুলো এতদিন সরকারের সচিব পর্যায়ের মধ্যেই আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়ে আসছিল। প্রশাসনের পক্ষ হতে পূর্বের রিপোর্টগুলোর সারাংশে লর্ড কার্জনের নিকট উপস্থাপন করা হয়। তিনি পক্ষে-বিপক্ষে বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ

ঐতিহাসিক কারণ: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল হতে বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাংলাকে ভাগ করার সুপারিশ করেন। ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্বিন্যাসের বহু প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিভাগীয় নিয়মনীতির নিগড়ে বাঁধা এতদসংক্রান্ত সচিব ও উপসচিবদের নোটগুলো আলোর মুখ দেখেনি। লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালে ভারতে ভাইসরয় হিসেবে আগমন করেন। তিনি পূর্বের রিপোর্টগুলোর ভিত্তিতে বাংলাকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

প্রশাসনিক কারণ: বঙ্গভঙ্গ ছিল মূলত একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলার আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং ১৯০৩ সালের দিকে এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। এ বিশাল আয়তনের ফলে পূর্ব বাংলার অনেকগুলো জেলা কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অবহেলিত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষা ছিল অবহেলিত। নদনদী ও খাঁড়িসমূহ দ্বারা অত্যধিক বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে পুলিশী কাজ চালানো ছিল বেশ অসুবিধাজনক। জলপথে সংঘবদ্ধ জলদস্যুতা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, প্রতিরক্ষা অথবা ভাষাগত সমস্যা সরকারকে বাংলার সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে উৎসাহিত করে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ

সামাজিক কারণ : মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে শাসনদণ্ড চলে যাওয়ার পর মুসলমানদের দুর্দিন নেমে আসে। প্রচলিত ফারসি ভাষার পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের পর মুসলিমরা প্রশাসনযন্ত্র হতে আরও দূরে চলে যায়। লাখেরাজ সম্পত্তিগুলো সরকারিকরণের ফলে মুসলমানগণ আরও সর্বস্বান্ত হয়। এককথায় সরকারি নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুসলিমগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তাতে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। পূর্ব বাংলা কলকাতা হতে দূরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এ অঞ্চলের বহু জেলা কার্যত ছিল বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত। তাই পূর্ব বাংলার সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ

অর্থনৈতিক কারণ: তৎকালীন সময়ে কলকাতা হয়েছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সবকিছুই কলকাতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা কিছু উন্নতি, অগ্রগতি হযেছিল, তার সবটুকুই ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কলকাতার সাথে পূর্ব বাংলার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল না। উপর্যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় এতদঅঞ্চল শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে ছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুধু কলকাতাতেই ২২টি কলেজ ও ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু সরকারিভাবে কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। অথচ পাটকেন্দ্রিক সকল কলকারখানা স্থাপিত হয় কলকাতার আশপাশে হুগলি নদীর তীরে। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আসাম ও পূর্ববঙ্গের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হতে পারত, যদি সরকারিভাবে একটু নজর দেওয়া হতো। পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক হওয়া সত্ত্বেও নদীকেন্দ্রিক কার্যকরী কোনো অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা হওয়ায় এ অঞ্চলে দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসব সার্বিক বিবেচনায় বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ

রাজনৈতিক কারণ: বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা ছিল ইংরেজদের জন্য অতীব জরুরি। ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত করে শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল ইংরেজদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত করে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা ছিল ইংরেজদের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এভাবেই লর্ড কার্জন 'Divide and Rule' নীতি প্রয়োগ করে একদিকে বাঙালি শক্তিকে দুর্বল করতে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের খুশি করতে চেয়েছিলেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের কার্যকর

১৯০৫ সালের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। এ প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়। এ প্রদেশের রাজধানী হয় কলকাতা। স্যার এনড্রু ফ্রেজার (Sir Andrew Fraser) পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বৃহত্তম নগরী ঢাকা হয় প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র। পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ ও রাজনীতিতে নবযুগের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের অগ্রগতি হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ঢাকায় নতুন নতুন সুরম্য অট্টালিকা, হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, আইনপরিষদ ভবনসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে যা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে ওঠে। ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি, রেললাইনের সম্প্রসারণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ তৈরি হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

তাছাড়া শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং উন্নত পূর্ব বাংলার সংস্পর্শে এসে আসামের উন্নতি হয়। পূর্ব বাংলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন হয় এবং নতুন প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয় এবং প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সাথে জনসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় হিন্দুসমাজ ও কংগ্রেসের কার্যকলাপ মুসলিম বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম নেতাদের কাছে সলিমুল্লাহ এ বিষয়ে প্রস্তাব পাঠান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ নামে একটি পৃথক সংগঠনের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এ দলটি মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

১. মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা নতুন প্রদেশের তথা 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এর রাজধানী হয়। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে মুসলমানগণ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হয়। অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা গড়ে উঠায় ঢাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানগণ তাদের হৃতগৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আনন্দে মেতে ওঠে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দিন ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটি আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্মসাধনায় এবং সংগ্রামে।" অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

২.হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অবস্থান ছিল খুবই কঠিন। বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। কলকাতার আইনজীবী সমিতি মনে করল বঙ্গভঙ্গের অর্থ নতুন প্রদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে, কলকাতার সাংবাদিকরাও তাদের স্বার্থ নস্যাৎ হবে জেনে এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ মনে করে, পূর্ব বাংলায় ক্রমোন্নতিশীল শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন হিন্দু সমাজের বিকাশ রোধের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ সরকার পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছে। কাশিম বাজারের এক জনসভায় সভাপতি মহারাজা মহীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, "নয়া প্রদেশে মুসলমান জনগণের রাজত্ব হবে- বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। আমরা নিজেদের মাটিতে আগন্তুক হয়ে পড়ব। এ সম্ভাবনায় আমি আতঙ্কিত। এ সম্ভাবনা আমাকে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগাকুল করে তোলে।"

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

৩. মুসলিম লীগের জন্ম: ১৯০৬ সালে কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করার জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকৃত হলে হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কট, অন্যদিকে উগ্র হিন্দুদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে বঙ্গভঙ্গ করেছিল তা বিভিন্ন কারণে রদ করতে বাধ্য হয়। কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে মন্তব্য করে, বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং বঙ্গভঙ্গ অযৌক্তিক ও অন্যায়। কলকাতা বুদ্ধিজীবী মহলের নেতৃস্থানীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এ পরিকল্পনাকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ, অযৌক্তিক, অন্যায় ও অহেতুক বলে মন্তব্য করেন। ফলে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

২. স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধবাদীরা বিলেতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে। বিলেতি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কারখানা মালিকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়। ফলে সমস্ত কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

৩. সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড: বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু হয় হত্যাযজ্ঞের মতো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। বাংলার গভর্নরকে হত্যার চেষ্টা করা হয় এবং লর্ড মিন্টোর রাজনৈতিক সচিব লন্ডনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ

৪. ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চরম উত্তেজনাকর খবর ছাপা হতে থাকে এবং শেষ পর্যায়ে তা 'ব্রিটিশ খেদাও' আন্দোলনে রূপ নেয়।

৫. বিদ্বেষ পোষণ উগ্র হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের কারণে নিজেদের স্বার্থ, মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ভেবে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।

উল্লিখিত কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বহুল প্রত্যাশিত বঙ্গভঙ্গকে রদ ঘোষণা করেন। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় আনন্দ উল্লাস করে আর বিপরীতে মুসলমানগণ হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, ব্রিটিশ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করে তা অঙ্কুরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে আবার বাংলায় গভর্নর জেনারেলের শাসন কায়েম করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি চাকরি লাভ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি পূর্ব বাংলার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের উন্মোচন হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে মুসলমানগণ দারুণভাবে ভেঙে পড়ে এবং তারা ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে বিরাগভাজন হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের সুফল ভোগের পূর্বেই তা রদ করায় ভারতের রাজনীতিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা নিম্নরূপ-

১. মুসলমানদের হতাশা: বঙ্গভঙ্গের ফলে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে উন্নয়নের যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তা মুসলমানদের মধ্যে নবউদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাদের মধ্যে নবকর্মসাধনা আর সর্বক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়। কিন্তু হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার যখন বাধ্য হয়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন তখন মুসলমানদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আকাশে কালো মেঘের পাহাড় সৃষ্টি হয়। তারা সার্বিক দিকে হতবিহ্বল হয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

২. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরাগভাজন: বঙ্গভঙ্গের ফলে এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানরা বিরাগভাজন হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করে।

৩. সাম্প্রদায়িকতার জন্ম: বঙ্গভঙ্গ একদিকে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে তোলে, অপরদিকে মুসলমানদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে। কিন্তু ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় তখন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চিড় ধরে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে রদ করার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনীহা, বীতশ্রদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণকে খুশি করার জন্য ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গঃ ঘটনা ও ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে রদ করার ফলে মুসলমানগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যদিও ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে এসে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলস্বরূপ ১৯২১ সালে ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৭ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

টপিক ০৭: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে নানাদিক থেকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি-প্রকৃতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলিমের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত কিছু পার্থক্য থাকলেও এ আন্দোলন দুটি হচ্ছে ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম জাতি খিলাফত আন্দোলন এবং স্বরাজ অর্জনের জন্য হিন্দু জাতি অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন

খিলাফত শব্দটি খলিফা হতে এসেছে। এর অর্থ উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি ইত্যাদি। এটি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত অর্থে মুসলমানদের প্রধান রাষ্ট্র নেতার পদবিরূপেও বলা হয়। খলিফা কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্রকে খিলাফত বলা হয়। ইসলামের প্রথম চার খলিফার যুগ শেষ হলেও খিলাফত থেকে যায়। ৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া এবং ৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসিগণ খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর মামলুক শাসকগণ, অটোমান সুলতানগণ খলিফা হিসেবে স্বীকৃত হতেন। খলিফাকে মুসলিম বিশ্বে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে যথাযথ সম্মান করা হতো। বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্রনায়কগণ তুরস্কের সুলতানের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করতেন এবং খুৎবায় ও মুদ্রায় খলিফার নাম উল্লেখ করতেন। খলিফা তাদের উপাধি, উপঢৌকন ও ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করতেন। খিলাফতের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট: ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক নিজ স্বার্থে জার্মানির পক্ষ হয়ে মিত্রশক্তি ব্রিটিশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে ভারতীয় মুসলমানগণ চরম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। কারণ তারা ধর্মীয় কারণে খলিফার প্রতি অনুগত, আবার অপরদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণ নিজ দেশের সরকার হিসেবে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল, যুদ্ধে বিজয়ী হলে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। যুদ্ধে জার্মানির সাথে তুরস্ক পরাজিত হয়। এতে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ১৯২০ সালের সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ হুকুমনামার (Mandate) ছদ্মাবরণে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্ক সাম্রাজ্যের এশীয় অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। প্রেস প্রদান করা হয় গ্রিসকে। মিত্রশক্তি (গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি) একজন হাইকমিশনারের মাধ্যমে পুরাপুরিভাবে তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করে। তুরস্কের সুলতানকে অপমানিত করা হয়। তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তির এহেন কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানগণ খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ভারতীয় মুসলিমগণ ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। এভাবে খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলনের ঘটনাবলি: মাওলানা মোহাম্মদ আলী, তার বড় ভাই মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এ সময়ে বোম্বাইয়ে ড. আনসারীর নেতৃত্বে খিলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর খিলাফত দিবস পালিত হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর দিল্লিতে বাংলার এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় খিলাফত সম্মেলন হয়। ঠিক এ সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্যারিস ও লন্ডন সফর করে। মিত্রশক্তি বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ এ প্রতিনিধি দলের বক্তব্যকে পাশ কেটে যান। প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র ভারত খিলাফতের দাবিতে হরতাল পালিত হয়। খিলাফত নেতারা ব্রিটিশ দ্রব্য ও পদবি বর্জন, আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ ও সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেন।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত আন্দোলন

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসের ১, ২ ও ৩ তারিখ এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে গান্ধী ও ছয়জন মুসলিম নেতার সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ১৮,০০০ মুসলিম-যাদের বেশিরভাগ ছিল সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকজন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্তানে হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু আফগানিস্তানের সরকার তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাধ্য হয়ে তারা ব্রিটিশ ভারতে ফিরে আসে। অনেকে প্রচণ্ড তাপদাহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এলাহাবাদের সম্মেলনে গঠিত সাব-কমিটির ফলে কংগ্রেস কর্ণধার গান্ধিজী খিলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্মতার ঘোষণা দেন। ১ আগস্ট ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে এক সাথে পরিচালিত হয়। এর পিছনে মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপক ভূমিকা ছিল।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর মূলনীতি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারকে অসহযোগিতা করা। মূলত অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল খিলাফত আন্দোলন। খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে মহাত্মা গান্ধী দেশের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক অপূর্ব সুযোগ হিসেবে এটাকে স্বরাজ লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস পান।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

একাধিক কারণে গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। রাওলাট আইন ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। এ আইনে সরকার জরুরি অবস্থায় যেকোনো মামলা বিচারক ছাড়াই নিষ্পত্তি করার বিধান রাখে এবং সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদেরকে জেলখানায় রাখার ব্যবস্থা করে। এ আইনের সংবাদ প্রকাশিত হলে গোটা ভারতব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। সকলে এটিকে নাগরিক অধিকারের মৃত্যুদূত হিসেবে আখ্যায়িত করে। রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেশকিছু ভারতীয় নিহত হয়। এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং নিহতদের আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় মিলিত হয়। এতে দশ হাজার লোক জমায়েত হয়। সভাস্থলটি চারদিকে মাটির দেয়াল ও ঘরদোর দিয়ে ঘেরা ছিল।

মহাত্মা গান্ধী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এ সভাস্থলে নিরস্ত্র ও আলোচনারত ভারতীয়দের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন ও আহতের সংখ্যা ছিল ২০০। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। ভারতীয় ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এ হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

২২ জুন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধী ভাইসরয়কে একটি পত্র দেন। এতে তিনি কুশাসনের আশ্রয় নেওয়া শোষককে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানান এবং সতর্কীকরণের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১ আগস্ট ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৪ হতে ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। মতিলাল নেহেরু আন্দোলন সমর্থন করেন। এতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়-

সকল অবৈতনিক পদ এবং স্থানীয় সরকারের মনোনীত সদস্য পদ হতে পদত্যাগ।

সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা বা তাদের সম্মানে আয়োজিত কোনো দরবার, চা-চক্র, যেকোনো অনুষ্ঠান বর্জন।

সরকারি স্কুল-কলেজ হতে সন্তানদের ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন।

সকল আইনজীবী ও মক্কেলগণ কর্তৃক ব্রিটিশ আদালত বর্জন এবং বেসরকারি সালিশি আদালত স্থাপন।

সামরিক বাহিনীর ভারতীয় সদস্যগণ, কেরানিগণ এবং শ্রমিকগণ মেসোপটেমিয়ায় কাজ করতে অস্বীকার করা।

পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বাইরে জোর করে কেউ পদপ্রার্থী হলে ভোটার কর্তৃক ভোটদানে অস্বীকৃতি।

বিদেশি সকল পণ্য বর্জন।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনাবলী

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাস হতে এ আন্দোলন সর্বভারতব্যাপী বেশ কিছুটা সাফল্য লাভ করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীসহ গান্ধী সমগ্র ভারত সফর করেন এবং শত শত জনসভায় ভাষণ দেন। প্রথম মাসে ৯,০০০ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে এবং ৮০০-এর অধিক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্জনের পক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সি. আর দাশ, মতিলাল নেহেরু, এম. আর. জয়াকর, প্যাটেল, আসফ আলী খান ও অন্যান্য বহু আইনজীবী আদালত বর্জন করেন। ১৯২০-১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে আমদানিকৃত বস্ত্রের মূল্য ছিল ১০২ কোটি টাকা যেখানে ১৯২১-১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে আমদানিকৃত মূল্যে দাঁড়ায় মাত্র ৫৭ কোটি টাকা। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত সফর করেন। ঐদিন গোটা ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হয়। রাস্তাঘাট জনশূন্য ও দরজা-জানালা বন্ধ করে তাকে বিরূপ সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতের সর্বত্র এ আন্দোলনের তীব্রতা অনুভূত হয়। আন্দোলনে নারীরাও শরিক হয়। বাংলায় বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা কর্মীসমাজ গঠিত হয়। সি. আর. দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও তার বোন উর্মিলা দেবী, জে. এস. সেন গুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা, এছাড়া মোহিনী দেবী, লাবণ্য প্রভা চন্দ্র প্রমুখ মহিলা অসহযোগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনাবলী

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিলুপ্তি: আন্দোলন দমন করতে সরকার ১০৮ ও ১৪৪ ধারা জারি করে। প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। গান্ধী সমর্থক ৩,০০০ ব্যক্তির এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা ২১ জন পুলিশ ও একজন ইন্সপেক্টরকে হত্যা করে। এ ঘটনা গান্ধীর নিকট বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তিনি আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কায় ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন স্থগিত করে দেন। এভাবে চূড়ান্ত সফলতা লাভের আগেই অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথে খিলাফত আন্দোলনও তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। শুধু গান্ধীর একার কথায় আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ ও বিভক্তি দেখা যায়। সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খিলাফতী মুসলিম লীগ। ১৯২২ সালের নভেম্বরে তুরস্কের সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের পদচ্যুতির সাথে সাথে তুর্কি সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। খলিফা আবদুল মজিদের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। ১৯২৪ সালের মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে তুরস্কে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে মুসলিম বিশ্ব হতে খিলাফতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল

বিভিন্ন দিক হতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে যে আন্দোলন হতে পারে এ আন্দোলন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন তার সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও ভারতীয় গণমানসে স্বাধীনতার বীজ বপন করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। রাজনৈতিক ময়দানে অবস্থান করে মুসলিমগণ শত্রু-মিত্র চেনার এবং নিজেদের সবল ও দুর্বল দিক চেনার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অসহযোগ আন্দোলন একটি অহিংস এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হলেও এটি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্দোলন। গান্ধীর একার কথায় আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ছিল এর দুর্বলতার পরিচায়ক। অসহযোগ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়। চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে 'স্বরাজ দল' গঠিত হয়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হয় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিভিন্ন স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দিল্লি, এলাহাবাদ ও নাগপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বরাজ পার্টির উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বলা যায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হতে আহরিত অভিজ্ঞতার ফলে মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' স্বতন্ত্রভাবে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ পায়। তাদের উপলব্ধিতে আসে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দুটি পৃথক সত্তা। মোটকথা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়েছে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

সাইমন কমিশন

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় জনগণের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তথা ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। তাই ভারতবাসী এ আইনে বিরোধিতা করে স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া নতুন আইন প্রণয়নের দাবি জানায়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের এ দাবির প্রেক্ষাপটে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। ব্রিটিশ উদারনৈতিক (Liberal Party) দলের সদস্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এবং তার নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয় সাইমন কমিশন। ব্রিটিশ ভারতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইনের কার্যকারিতা অনুসন্ধান এবং আরও শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দেওয়া না দেওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করার ভার এ কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

স্যার জন সাইমন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

সাইমন কমিশন

কিন্তু কমিশনের কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতীয় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং একে পুরাপুরি 'শ্বেতাঙ্গদের কমিশন' বলে আখ্যা দেন। ভারতীয় কংগ্রেস, জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ এবং ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন দল এ কমিশন প্রত্যাখ্যান করে। সাইমন কমিশন ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে এলে কালো পতাকা প্রদর্শন এবং 'সাইমন ফিরে যাও' স্লোগান দিয়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ফলে ভারতীয়দের বিরোধিতা এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই সাইমন কমিশন কাজ শেষ করে এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে দুই খণ্ডে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট ছিল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার এক আকর্ষণীয় এবং ব্যাপক পর্যালোচনার দলিল। নিচে সাইমন কমিশনের

স্যার জন সাইমন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

সাইমন কমিশন

উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো বর্ণনা করা হলো-

১. সাইমন কমিশন সাংবিধানিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র (All Indian Federation) গঠনের সুপারিশ করে। ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে এ ফেডারেশন গঠিত হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

২. ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে কমিশন দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর সুপারিশ করে। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়াদির তালিকা বাদ দিয়ে প্রতিটি প্রদেশে একক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন সুপারিশ রাখে।

৩. সাইমন কমিশন প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সুপারিশ করে। প্রতিটি প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। এ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলোই পরবর্তীকালে প্রস্তাবিত ফেডারেল কাঠামোর ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়।

৪. প্রাদেশিক আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা ২০০ থেকে ১২৫০-তে উন্নীত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করে।

সাইমন কমিশন

৫. সিন্ধু ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হবে কিনা সে প্রশ্নটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুনরায় যাচাই করা দরকার বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। তবে কমিশন বার্মার প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করার জন্য সুপারিশ করে।

৬. মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে কমিশন যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করে।

৭. সাইমন কমিশন ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় পরিষদ (কাউন্সিল) গঠনের সুপারিশ করে; যার কাজ হবে মূলত উপদেষ্টামূলক (Advisory)

সর্বোপরি সাইমন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কেননা ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদান করাই ছিল ভারতীয়দের প্রধান দাবি। কমিশন এ দাবির প্রতি কোনোরূপ সমর্থন প্রদান করেনি। পাশাপাশি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এছাড়া এ কমিশনে কোনো ভারতীয় নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এরূপ বহুবিধ কারণে ভারতবর্ষ এ কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করে। যার দরুন সাইমন কমিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

নেহেরু রিপোর্ট

ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্টের গুরুত্ব অপরিসীম। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কয়েক দফা চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে সকল দলের সহযোগিতায় একটি 'স্বরাজ সংবিধান' রচনার আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীতে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বাইতে সর্বদলীয় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে উক্ত কমিটির প্রধান করা হয়। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে এ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে ইতিহাসে তাই 'নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

মতিলাল নেহেরু

নেহেরু রিপোর্ট

নেহেরু রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য: নেহেরু রিপোর্টে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কতকগুলো দাবি চূড়ান্ত করা হয়। এ রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এর বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়-

প্রথমত, নেহেরু রিপোর্ট ভারতের সংবিধানের মূলনীতি স্থির করে। এক্ষেত্রে নেহেরু কমিটির সম্মুখে দুটো বিকল্প ছিল-একটি ছিল স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ (Complete Independence) এবং অপরটি ছিল ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status)। কমিটি অবশ্য ডোমিনিয়ন মর্যাদার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ কায়েমের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন প্রশ্ন নিয়ে নেহেরু রিপোর্ট যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে। কমিটির সম্মুখে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হবে, না যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা হবে এ প্রশ্নটি নিয়ে কমিটি বিস্তারিত আলোচনা করে। কমিটি মনে করে, জাতীয় চেতনা বিকাশের জন্য পৃথক নির্বাচন ক্ষতিকর। তাই কমিটি যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দেয়।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে নেহেরু কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ বিবেচনা করে। এসব সুপারিশ বিবেচনার পর কমিটি অভিমত প্রকাশ করে, সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন সংরক্ষণের ধারণাটি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানেরই নামান্তর। তাই আসন সংরক্ষণের বিধান বাতিল করা হয়। তবে কমিটি মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু কেবল সেসব প্রদেশেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখে। অনুরূপভাবে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

নেহেরু রিপোর্ট

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় আইনসভায় লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের যে সুযোগ দেওয়া হয় নেহেরু রিপোর্ট তা নাকচ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের দাবি স্বীকৃত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে। নেহেরু কমিটি অভিমত প্রকাশ করে, ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বিধায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাদের এক-চতুর্থাংশের অধিক আসন প্রদান করা উচিত হবে না।

পঞ্চমত, নেহেরু রিপোর্ট মুসলমানদের সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করার দাবিটি সবিস্তারে আলোচনা করে এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আর্থিক সংগতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের পর সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করা উচিত। অর্থাৎ সিন্ধুর পৃথককরণকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়।

সুতরাং উক্ত নেহেরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল অনিবার্য। মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই মনে করে, কোনোরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই সিন্ধু প্রদেশের ব্যাপারে মুসলিম লীগের দিল্লি প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ব্যাপারে সংস্কারও ছিল মুসলিম লীগের অন্যতম দাবি।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

নেহেরু রিপোর্ট

অর্থাৎ মুসলমানরা একে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে করে। সর্বোপরি নেহেরু রিপোর্ট প্রস্তাবিত সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করার সুপারিশ করে। তবে তাতে মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচ না থাকায় মুসলমানরা এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয় এবং দলমত নির্বিশেষে এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নেহেরু রিপোর্ট সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের কট্টরপন্থিদের চাপে কংগ্রেস জিন্নাহর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। মুসলিম লীগ এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নেহেরু রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছে বলে ঘোষণা করে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

ভারতীয় মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার প্রতি নেহেরু রিপোর্টে উপেক্ষা প্রদর্শিত হওয়ায় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জিন্নাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নেহেরু রিপোর্টে কিছু সংশোধনী আনেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন সংরক্ষণ, রেসিডুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া ইত্যাদি ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু মহাসভাসহ অন্যরা জিন্নাহর প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় জিন্নাহ একে হিন্দু-মুসলমানের পথের বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন তেজ বাহাদুর সাপ্রু। কিন্তু বহু সদস্য তাতে রাজি না হওয়ায় সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লিতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ তার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা উপস্থাপন করেন। দফাগুলো নিম্নরূপ-

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

১. ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গঠন হবে ফেডারেল পদ্ধতির। রেসিডুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে।

২. একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন সব প্রদেশকে দিতে হবে।

৩. প্রদেশসমূহের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তবে সে প্রতিনিধিত্বের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

৪. মুসলিম প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হবে।

৫. প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে কোনো সম্প্রদায় ইচ্ছা করলে পৃথক নির্বাচনের বদলে যেকোনো সময় যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন দ্বারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

৭. সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার দিতে হবে।

৮. কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া কোনো আইন পরিষদ বা নির্বাচিত সংস্থায় উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

৯. বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে পৃথক করতে হবে।

১০. ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. অন্য ভারতীয়দের ন্যায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরিতে যোগ্যতা অনুসারে পর্যাপ্ত হারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১৩. কমপক্ষে সংখ্যানুপাতিক এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্র বা কোনো প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা যাবে না।

১৪. ভারত ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত সব রাজ্যের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

সর্বোপরি উল্লিখিত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে, ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের নেহেরু রিপোর্ট ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই সৃষ্টি করে বেশি। তবে এতে মুসলমানদের একটা লাভ হয়, ইতোপূর্বে বিভক্ত মুসলিম উপদলসমূহ তখন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশ নেয়। এছাড়াও পরবর্তীকালে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মূলত জিন্নাহর চৌদ্দ দফার ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছিল। তাই ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নাহর চৌদ্দ দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক

ভারতে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলছিল। ঐ বছরের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। ব্রিটিশ সরকার সে অবস্থায় লন্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করে। ভারতে বিরাজমান পরিস্থিতি ও সংকটের নিরসনকল্পে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন করাই ছিল - এ বৈঠকের উদ্দেশ্য। আহূত বৈঠক তিনটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। ইতিহাসে এটি 'গোলটেবিল বৈঠক' নামে পরিচিত।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক: ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে ১৬, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে ১৩ এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে ৫৭ জনসহ সর্বমোট ৮৯ জন সদস্য যোগ দেন। কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ দেয়নি। উপস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. আম্বেদকার, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং তেজ বাহাদুর সাপ্রু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে মেকডোনাল্ড এ বৈঠকে কতকগুলো সাংবিধানিক প্রস্তাব দেন। তার মধ্যে ১. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, ২. প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার এবং ৩. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো অন্যতম।

মোটামুটিভাবে ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবগুলো মেনে নিলেও মুসলিম প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যূনতম দাবি হিসেবে তার চৌদ্দ দফা দাবির পুনরুল্লেখ করেন। ডক্টর আম্বেদকারও তপশিলি সম্প্রদায়ের তরফ থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবি করা হয়। হিন্দু প্রতিনিধিরা যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন, যদিও তারা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করেন। একপর্যায়ে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করায় গোল টেবিল বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক: ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধী আরউইন চুক্তির পর লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধিরূপে এম. কে. গান্ধী এ বৈঠকে যোগদান করেন। ফেডারেল ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘু প্রশ্ন এ দুটি ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুরুতে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বের একমাত্র দাবিদার বললে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে এর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কিন্তু গান্ধী এতে রাজি ছিলেন না। বরং তিনি অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে একই সঙ্গে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। পাশাপাশি বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক

প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল রাখার আবেদন করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। শত চেষ্টা করেও গান্ধী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের স্বমতে আনতে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মেকডোনাল্ড ঘোষণা করেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবাসী এ বিষয়ে একমত হলে তবেই ব্রিটিশ সরকারের কিছু করণীয় আছে। ফলে এসব সমস্যা অমীমাংসিত রেখেই ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

গোল টেবিল বৈঠক

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক: ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন বসে এবং ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। আগের দুটি অধিবেশনের তুলনায় অনেক কম প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসও এ অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায়নি। এ সম্মেলনে তিনটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়। যথা-

১. রাজ্যগুলো কী কী শর্তের ভিত্তিতে ফেডারেশনে যোগ দেবে,

২. অবশিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন এবং

৩. ব্রিটিশ শাসনের গ্যারান্টি।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিনিধিবর্গের অনেক দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ভারতে তখনও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। তাই ভারতীয় জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কিছু সমস্যার সমাধান অমীমাংসিত রেখেই গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার ফলাফল একটি শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করে।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য/ধারা: ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

প্রথমত, ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও তার মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রিগণ আইনসভার মধ্য থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োজিত হবেন এবং তারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, দ্বৈতশাসনের পরিবর্তে এ আইনে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসনব্যবস্থার প্রধান হবেন একজন গভর্নর। জনগণের নির্বাচনে গঠিত হবে একটি আইনসভা। এ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নরকে পরামর্শদান ও সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভর্নরের এখতিয়ারে থাকবে। মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন প্রাদেশিক আইনসভার নিকট। গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হয়। সে ক্ষমতাবলে তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারবেন। তাছাড়া যেকোনো অর্ডিন্যান্স বা জরুরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও তার হাতে ন্যস্ত ছিল।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

তৃতীয়ত, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের আইনে কেন্দ্রে একটা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চকক্ষটি রাষ্ট্রসভা এবং নিম্নকক্ষ ফেডারেল পরিষদ নামে অভিহিত হবে বলে স্থির হয়। মোট ১১টি গভর্নর শাসিত প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এবং অবশিষ্ট পাঁচটিতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী কেন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশেও মুসলিম ও অনুন্নত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়।

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দু ভাগে বিভক্ত হবে। সংরক্ষিত বিষয়গুলোর যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্ম ও উপজাতি সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তিন জন উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলো যথা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবে। ক্ষমতার এ বণ্টন দ্বারা কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। এ আইনে গভর্নর জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভার পরামর্শ না নিয়েই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদান স্বেচ্ছামূলক করা হয়। আইনে এটাও বলা হয়, ফেডারেল আইনসভার উচ্চপরিষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক দেশীয় রাজ্যগুলো দ্বারা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না।

পঞ্চমত, ভারত সচিবের কাউন্সিল এ আইনের বলে বিলুপ্ত হয়। বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়। সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে এ আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আইনের প্রতিক্রিয়া: সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা তা কার্যকর করা হয়নি। তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক দল এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র নিন্দা জানায়। জওহরলাল একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিযোগ করেন, এ আইনে স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। এছাড়াও হিন্দু মহাসভা এ আইন সমর্থন করেনি। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সমালোচনার পাশাপাশি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৮ লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

টপিক ০৮: লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

দ্বিজাতি তত্ত্ব ছিল দ্বিধাবিভক্ত জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। এর মূলকথা হলো ভারতবর্ষে দুটি পৃথক জাতি রয়েছে- হিন্দু জাতি এবং মুসলিম জাতি। দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন, হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধ মৌলিক।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাব

দ্বিজাতি তত্ত্বের পটভূমি: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর হিন্দুগণ সহজে নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের জাগতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। হিন্দুরা ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সহজেই আত্মস্থ করে আত্মোন্নতিতে সক্ষম হয়। এ শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুসলিমগণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। ফলে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় এগিয়ে যায়। বৈষয়িক সাফল্য হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার শ্রেয়বোধের জন্ম দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই স্বাভাবিক ভারতে উন্মুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে নিজ সম্প্রদায়ের জাগরণের প্রচেষ্টা অধিক লক্ষ করা যায়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গঠন করেন।

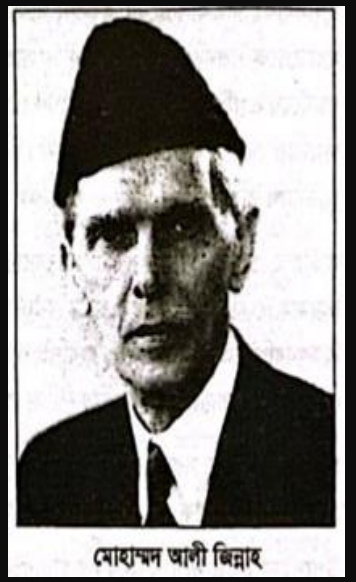

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাব

কলকাতাকেন্দ্রিক পেশাজীবী, কলকারখানার মালিক, ভূস্বামী, আইনজীবী সর্বোপরি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস কলকাতাকেন্দ্রিক মহলের পক্ষ নেয়। এতে মুসলমানদের নিকট কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়। এতে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বভারতীয় উদীয়মান জাতীয়তাবাদী শক্তি অনেকটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ আত্মপ্রকাশ করে। এতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষপর্যন্ত মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৪ দফার মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। মূলত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মতানৈক্যের ফলে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের সম্ভাবনা বিলীন হতে থাকে। ১৪ দফার মূলসুর কালক্রমে পাকিস্তানের দার্শনিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক শাসন সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো শুধুমাত্র কার্যকর হয়।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাব

এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেশিরভাগ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগের মতামত ছাড়াই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। দু'একজন মুসলিমকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণের শর্ত দেওয়া হয়। ভারতে দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়- একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর এরূপ মন্তব্য করায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ আরও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হয়, তাতে তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস 'হিন্দু'নীতি' অনুসরণ করছে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভায় হিন্দু ও মুসলিম দুটি ভিন্ন জাতি বলে ঘোষণা দেন। এভাবে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিও করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আবারও বলেন, "ভারত এক জাতি নয়, বরং দুই জাতির দেশ।" এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব ঘোষিত হয়।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাব

জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা: ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি আল্লামা ইকবাল তার একটি ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবি করেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মহাকবি ইকবাল ও রহমত আলীর সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতায় তিনি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ২২ মার্চ ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন, "Mussalmans are a nation according to any definition of a nation". এটিই ছিল জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ এ. কে. ফজলুল হকের প্রস্তাবনায় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তা ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। লাহোর প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয় পাওয়া যায়। ১. ভৌগোলিক দিক থেকে পাশাপাশি এলাকাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে; ২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে; ৩. এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে; ৪. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে ও ৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য: কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস ও হিন্দু

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য: কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগকে 'পাপ কাজ' বলে উল্লেখ করেন। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠনকে 'অবান্তর' বলে মন্তব্য করেন। কংগ্রেস প্রভাবাধীন পত্রিকাগুলো মূলত সমালোচনা ও অবজ্ঞাসূচক অর্থে লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পত্রিকায় শিরোনাম করে। অথচ প্রস্তাবের কোথাও একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বা 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ ছিল না।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী মনে করেন যে, প্রত্যেক প্রদেশ তার প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করবে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। বাঙালি মুসলিমরা শাসন ক্ষমতা ভোগ করবে। তৎকালীন পূর্ব বাংলা মুসলিমগণ এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া: ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় তথা মুসলিম লীগকে পাশ কেটে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। তাই ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিবর্তে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির পথ বেছে নেয়।

লাহোর প্রস্তাবের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা: লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। পরে আবার বলা হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী অঙ্গরাজ্য স্বায়ত্তশাসিত হতে পারে কিন্তু সার্বভৌম হতে পারে না। আবার কোনো রাষ্ট্র সার্বভৌম হলে, তা আর অঙ্গরাজ্য থাকে না।

লাহোর প্রস্তাবঃ দ্বিজাতি তত্ত্ব

লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু

লাহোর প্রস্তাবে বাংলাদেশের বীজ: ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এজন্য প্রস্তাবে 'Independent States' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Muslim League Legislators Convention.' এ অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ পরিবর্তনের পিছনে দলীয় কোনো নিয়মতান্ত্রিক সমর্থন যেমন ছিল না, তেমনি এর নৈতিক ভিত্তিও ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে এ মূলগত পরিবর্তন সাধন করেন।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব: ভারতবর্ষের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। লাহোর প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের একটি জাতি হিসেবে পরিচিতি তুলে ধরা হয়। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে সরকার ও কংগ্রেস ছাড়া কোনো শক্তি নেই। লাহোর প্রস্তাবে তার বক্তব্যে অসাড়তা তুলে ধরা হয়। রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুসলিমগণ নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। লাহোর প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম সম্প্রদায় তথা মুসলিম লীগকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, "ভুলবশত প্রায়ই বলা হয়, মুসলিমগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু আসলে তা নয়। বহুজাতীয় জনসমাজ নিয়ে এ উপমহাদেশ গঠিত- তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম দুটি বৃহৎ জাতি।" দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তব পরিণতিতে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ০৯ ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

টপিক ০৯: ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তা এবং হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তা প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে থাকে। তবে মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনের আওতায় নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিলে ঐক্যে আবার ভাঙন দেখা দেয়। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি এ মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার বেশ বেকায়দায় পড়ে। ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি সর্বত্র পশ্চাদপসরণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মীমাংসায় পৌঁছতে চাপ দেয়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার অঙ্গীকার করে, যুদ্ধ শেষে তারা ভারতের স্বাধীনতা প্রদান করবে। শ্রমিকদলীয় নেতা ক্রিপস ১৯৪২ সালে ভারতে এসে সকল মহলের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় ভারতীয়দের মনে জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এ চিন্তা থেকে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। ক্রিপসের ব্যর্থতার পর পরই গান্ধী তার সত্যাগ্রহ 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী এক ঘোষণায় বলেন, "আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই।" তিনি আরও বলেন, "আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এটি হবে আমাদের জীবনের শেষ লড়াই।" ইংরেজ সরকার ঐ সময় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা দমননীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেসের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ- গান্ধিজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু গ্রেফতার হন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার জনগণকে আতঙ্কিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলে। জনগণের জন্য কোনো প্রকার দিক নির্দেশনা ছিল না। ফলে আন্দোলন সহিংস রূপ লাভ করে। আন্দোলন পরিণত হয় বিদ্রোহে। নেতাদের মুক্তির দাবিতে সর্বত্র হরতাল, কলকারখানা, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হতে থাকে। আন্দোলন নেতৃত্বহীনভাবে সামনে এগিয়ে যায়। এ অবস্থায় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষকে আরও ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

অভ্যন্তরীণ নীতি: ইংরেজদের তাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টায় দেশে চরম হতাশা বিরাজ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এ বাহিনীকে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে গান্ধিজীর সঙ্গে সুভাষ বসুর মতের অমিল ছিল। সবশেষে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। তার রাজনীতি আপসহীন পথে চলতে থাকে। তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইংরেজ সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। সরকার বার বার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। সবশেষে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে জেল হতে ছাড়া পেয়ে তিনি ইংরেজ সরকার উৎখাতের লক্ষ্য নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি ইংরেজদের শত্রু দেশ (তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল) জার্মানিতে গমন করেন। তিনি ভারত হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য জার্মানের সাহায্য কামনা করেন। এরপর তিনি জাপানে গিয়ে জাপানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ উৎখাতের চেষ্টা করেন। বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েও তিনি তার দল আজাদ হিন্দ ফৌজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

তবে তার দেশপ্রেম ও বীরত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন হয়। এতে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের নির্বাচন দেয়। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনি ইশতেহার করে মুসলিম লীগ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এ নির্বাচনের ফলাফল এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক ছিল। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম ভোটারগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট হয়, মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল মুসলিম লীগ। এতে মুসলিম লীগের এ জয়ের পিছনে বাঙালি মুসলিম ভোটারের অবদান ছিল ব্যাপক। এতে পাকিস্তান অর্জনের পথে আর কোনো দুরূহ বাধা থাকল না।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

ইংল্যান্ডের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি বুঝতে পারেন, ভারতে সম্মানজনকভাবে বেশিদিন ব্রিটিশদের পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য আগমন করেন। এ প্রতিনিধি দলকে ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বলা হয়। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সংকট সমাধানের আহ্বান জানায়। এ ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের গঠন বিষয় উল্লেখ করা হয়। যেমন- ১. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা; ২. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা ও ৩. হিন্দু প্রধান গ্রুপ, মুসলিম প্রধান গ্রুপ এবং আসাম ও বাংলা গ্রুপ- এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি করে গণপরিষদ গঠন করা। উল্লেখ থাকে, এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সার্বিকভাবে করতে হবে, এর অংশবিশেষ করা যাবে না।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির পটভূমি

কংগ্রেস এ সমতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কংগ্রেসের দাবির মুখে মন্ত্রিমিশন অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিলে পাঁচের পরিবর্তে ছয়জন কংগ্রেস সদস্য নিয়েছেন, তন্মধ্যে একজন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধি। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি নেহেরু মুসলিম লীগের স্বার্থবিরোধী কিছু বক্তব্য দেন। এতে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুলাই জিন্নাহ বোম্বেতে লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে সরকার ও কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) মুসলিম লীগের পক্ষ হতে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত বিভক্তির ঘোষণা

১৬ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মন্তব্য করেন, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য লর্ড ওয়েভেলের স্থলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মুসলিম ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান, ভারত বিভক্তি ছাড়া এর কোনো বিকল্প সমাধান নেই। প্রথমদিকে কংগ্রেস ভারত বিভক্তিতে সায় না দিলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশরক্ষার জন্য সায় দিতে বাধ্য হয়। ৩ জুন ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন সুস্পষ্টভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৫ জুলাই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে কমন্সসভার এক ঘোষণায় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল-এর পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে ভারতে পাঠান। তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুন নেহেরু, জিন্নাহ ও শিখ নেতা বলদেব শিং-এর সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এটিই 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত।

মাউন্টব্যাটেন যেসব পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরেন তা নিচে দেওয়া হলো-

১. ভারতীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধান রচনার দায়িত্ব পালন করবে।

২. যেসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গণপরিষদে যোগ দেবে না, তারা নিজেদের জন্য সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে পৃথক গণপরিষদ গঠন করতে পারবে।

৩. বর্তমান গণপরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে। তবে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ যদি ইচ্ছা করে তবে গণপরিষদে প্রণীত বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে অথবা হবে না।

৪. বাংলা ও পাঞ্জাব 'পাকিস্তান' কিংবা 'ভারতীয় ইউনিয়নে' যোগ দেওয়ার প্রশ্নে বিভক্ত হবে কিনা তা ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হবে।

৫. বাংলা ও পাঞ্জাব যদি বিভক্ত হয় তবে নতুন করে এসব প্রদেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করা হবে।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

৬. বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আসামের সিলেট জেলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশের সাথে মিলিত হবে কিনা এজন্য 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হবে।

৭. সিন্ধু প্রদেশ ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা তা সে প্রদেশের আইনসভা সিদ্ধান্ত নেবে।

৮. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিবে তা সে প্রদেশের আইনসভা সিদ্ধান্ত নেবে।

৯. এ পরিকল্পনা ব্রিটিশ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব ঘোষিত নীতি বহাল থাকবে।

১০. এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এ বছরই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাস হবে।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব: ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য যখন তীব্র হচ্ছিল তখনই বাংলার কয়েকজন নেতা অখণ্ড বাংলা গড়ার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বেশ কয়জন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তারা হচ্ছেন শরৎবসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেমও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শরৎবসুর সক্রিয় সমর্থনের কারণে প্রস্তাবটি ইতিহাসে 'বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত। বাংলার এ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন কংগ্রেস ও লীগের কাছে দলীয় স্বার্থই বড়। বাংলার স্বার্থের কথা কখনই তারা বিশেষ বিবেচনায় রাখবে না। তাই অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব ঘোষণা ও বিশ্লেষণ করেন শরৎবসু ও সোহরাওয়ার্দী। তাঁদের মতে এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা সম্ভব। এ প্রস্তাবের ভিতর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এবারও প্রথম বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই। কংগ্রেসের অবাঙালি ও রক্ষণশীল সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় কংগ্রেস এবার অখণ্ড বাংলার বদলে পাকিস্তান দাবিতেই ভারত বিভাগে রাজি হয়ে যায়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত শাসন (স্বাধীনতা) আওনের বৈশিষ্ট্য

ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট হতে এ আইন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং ভারতকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুটি নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এ আইন উক্ত ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) স্বীকার করে নেয়।

২. সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, সাবেক পূর্ব বাংলা ও সিলেট জেলায় মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে এ আইন অনুসারে পাকিস্তান গঠিত হয় এবং মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা, সিলেট জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ছাড়া আসাম, দিল্লি, আজমীর নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়।

৩.১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের (Constituent Assemble) কাছে নতুন শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত গণপরিষদ দুটো স্ব-স্ব দেশের আইন সভারূপেও কাজ করে যাবে। সুতরাং গণপরিষদের কাজ হলো ভবিষ্যতের জন্য দুটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্য সম্পাদন।

ভারত শাসন (স্বাধীনতা) আওনের বৈশিষ্ট্য

৪. কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নের জন্য একজন করে গভর্নর জেনারেল থাকবে এবং ডোমিনিয়ন কেবিনেটের পরামর্শক্রমে ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবেন। তবে তিনি হবেন, একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। তার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (Individul Judgement) ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionery Powers) বিলুপ্ত হবে।

৫. ডোমিনিয়নদ্বয় এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার তাদের প্রদান করা হয়।

৬. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ভারত স্বাধীনতা আইনে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্নরদের যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়। এখন হতে তারা হলেন প্রদেশে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি মাত্র। তারা কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে বরং নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে পরিগণিত। মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে এবং প্রাদেশিক গভর্নর মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কার্য সম্পন্ন করবেন।

ভারত শাসন (স্বাধীনতা) আওনের বৈশিষ্ট্য

৭. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্টের পর হতে এ আইন অনুসারে ডোমিনিয়ন বা প্রদেশগুলোতে শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রথম কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। উভয় ডোমিনিয়নই ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। উভয় ডোমিনিয়নের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাতিল করার কোনো ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের থাকবে না।

৮. এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং সন্ধি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট হতে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ইচ্ছামতো ভারতে বা পাকিস্তানে যোগদান করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

৯. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারত সচিবের পদকে বিলুপ্ত করে। ভারতে বা পাকিস্তানের শাসনক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব আর হোয়াইট হলের (White Hall) ওপর না থেকে দিল্লি ও করাচির ওপর ন্যস্ত হয়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারত শাসন (স্বাধীনতা) আওনের বৈশিষ্ট্য

ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব ও ফলাফল: লর্ড মাউন্টব্যাটনের পরিকল্পনার আলোকে ভারত স্বাধীনতা আইনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনকেই অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে রূপান্তর করা হয়। এ আইনে

তিনটি ফলাফল লক্ষ করা যায়-

১. পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি ভিন্ন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হয় এবং এ ডোমিনিয়ন দুটি ছিল সমান মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বায়ত্তশাসিত।

২.পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ডোমিনিয়ন আইনসভায় যেসব আইন গৃহীত হতো তাতে স্বাক্ষরদানের পূর্ণ অধিকার থাকত গভর্নর জেনারেলের।

৩. ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এ গণপরিষদের ওপর দায়িত্ব ছিল দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসেই মাউন্টব্যাটেন সকল দলের নেতাদের আহ্বান জানালেন, দেশ বিভাগের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা যেন মেনে নেওয়া হয়। এ সময় নেহেরু, জিন্নাহ ও সরদার বলদেও সিং মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেডিওতে বক্তৃতা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হবে। তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব লর্ড ইজমে তখন ভাইসরয়কে একটা নোট লিখে পাঠান। শিরোনাম ছিল 'ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান'। তিনি মত প্রকাশ করেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। তাই নিম্নলিখিত
বিষয়গুলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে বিবেচনায় রাখা জরুরি-

১. ভারত-পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। সকালের দিকে দিল্লিতে এবং বিকেলের দিকে করাচিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাতে ভাইসরয়ের যোগদান সম্ভব।

২. দিল্লির অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকের সাথে করা উচিত। এ ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে ভাইসরয়ের ইচ্ছার বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত যাবে না।

৩. দিল্লির ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান দরবার হলে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যাশা থাকবে ১৫ আগস্ট মহামান্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রানির বাণী ভাইসরয় পড়ে শোনাবেন।

৪. উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে যোগদান নিশ্চিত করতে হবে।

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

৫. ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে উভয় ডোমিনিয়ন তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে অন্তত একটি ইউনিট গড়ে তুলবে। ব্রিটিশ সৈন্যদেরও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট মজুদ থাকবে।

৬. লন্ডনে ইন্ডিয়ার অফিসে এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে একটি চিঠি লিখতে হবে।

লর্ড ইজমের প্রস্তাবের বেশকিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ প্রশাসন অংশগ্রহণ করুক এটি জিন্নাহ বা নেহেরু কেউ চাননি। তবে ১৪ আগস্ট করাচির স্বাধীনতা দিবসের প্রথম অনুষ্ঠানে জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের বাণী পাঠানোর যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল ব্রিটেনের শ্রমিক দলের সরকার তার সাথে একমত হতে পারেনি। কারণ তাদের ধারণা ছিল বিষয়টি ভারতীয় জনগণ পছন্দ করবে না।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান: মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ১৩ আগস্ট করাচি পৌছেন। বিকেলের আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় জিন্নাহ দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। ভাইসরয়ও সেখানে তার বক্তব্য দেন। ভাইসরয় ১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্দেশে এক ভাষণে পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ঐদিন বিকেলেই দিল্লিতে ফিরে আসেন।

১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দিল্লিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ দিল্লির দিকে ছুটে আসতে থাকে। ১৫ আগস্ট নেহেরু ভারতীয় বিধানসভার উদ্দেশে এক ভাষণে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দের উদ্বেল হয়ে পড়ে দিল্লি তথা ভারতে। এভাবেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ২২ মার্চ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন। সে সময় ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ছিল ভীষণ জটিল। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিল ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় বের করতে ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। যেকোনো উপায়ে ভারতের সংকট সমাধান করার অভিপ্রায় নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন। তিনি মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ভারত বিভক্তি ছাড়া আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নেই। ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে ভারত বিভাগ করার উদ্দেশে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ব্রিটিশ সরকার ৩ জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বিবৃতির মাধ্যমে এ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইতিহাসে এটি 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গণভোটের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-পাঞ্জাব পাকিস্তানে যোগ দেয়। অপরদিকে পূর্বপাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতের সাথে যোগ দেয়। সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জনগণ গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে মত দেয়। ১৯৪৭ স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানকে ১৬০০ কি. মি. দূরত্বের ভারতীয় অংশ দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্ত পূর্ব বাংলার একক প্রদেশে গঠিত ছিল। যেটিতে তৎকালীন ব্রিটিশরাজ প্রদেশের আসাম রাজ্যের সিলেট জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভারত বিভক্তি ১৯৪৭ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রান্ত তিনটি পূর্ণ প্রদেশ (খাইবার-পাখতুনখোয়া, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সিন্ধু) একটি প্রধান কমিশনারের প্রদেশ (বেলুচিস্তান) ১৩টি দেশীয় রাজ্য এবং কাশ্মীয়ের অংশ দ্বারা গঠিত ছিল। ১৯৪৮ সালে করাচির আশপাশের এলাকাকে সিন্ধু প্রদেশ হতে ফেডারেল রাজধানী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালে পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশকে 'পাঞ্জাব' নামে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫২ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি দেশীয় রাজ্যকে নিয়ে বেলুচিস্তান রাজ্য ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ১৯৫৫ সালে ইকান্দার মির্জা এক ইউনিট ব্যবস্থানীতি জারি করেন। যার ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি নতুন প্রদেশে যুক্ত করা হয়। যার রাজধানী হয় লাহোর। একই সাথে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়, যার রাজধানী হয় ঢাকা। ১৯৬০ সালে ফেডারেল রাজধানী করাচি হতে রাওয়ালপিন্ডিতে স্থানান্তর করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে ইসলামাবাদে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানকে ভেঙে চারটি নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ নামে বিশ্ব মানচিত্রে নতুন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্ম হয়; জন্ম হয় একটি পতাকার।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ফরহাদ চৌধুরী একজন সমাজপতি। তিনি তার এলাকায় একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নানা জায়গা থেকে তার সমিতিটিতে জ্ঞানী-গুণীজন আসতে থাকেন। তাদের নাতিদীর্ঘ আলোচনায় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হতে থাকে। নানা সমস্যার সমাধান হয়। এছাড়া শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমিতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে থাকে। এর কল্যাণে পশ্চাৎপদ এলাকাটি ধীরে ধীরে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে।

ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ কত সালে 'নওয়াব' উপাধি পান?

খ. খিলাফত আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফরহাদ চৌধুরী সাহিত্য-সমিতির সাথে উনিশ শতকের কোন সাহিত্য সমিতির মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত-যুক্তি সাপেক্ষে প্রমাণ কর।

[সকল বোর্ড '১৯]

চাকলা রোশনাবাদ পরগনার রাজা মানিক্য বাহাদুর শাসন পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হন। সমতলে সাধারণ বাঙালি কৃষক-প্রজা, পাহাড়ে ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতি প্রজার বসবাস। একদিকে হিন্দু, মুসলিম ও পাহাড়িদের ধর্মীয় বিরোধ, অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী প্রজার জমিদারি প্রথা বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন, তাকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। জমিদার বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের জন্য তিনি কৌশলে প্রজাদের ধর্মীয় বিরোধে প্রণোদনা দেন। এতে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকট হলে, তিনি পরগনাকে দুভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। একদল মানুষ তার পরগনা বিভক্তিকে সমর্থন করলেও আরেক দল এর তীব্র প্রতিবাদ করে। পরিশেষে তিনি পরগনা ভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।

ক. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কেন গঠন করা হয়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের মতো ব্রিটিশ সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রতিও জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র?'- বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

[য বো. '১৭; কু. বো. '১৭; সি. বো. '১৭: ব. বো. '১৭: দি. বো. '১৭]

দেশটি দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের নিপতিত হয়। উক্ত শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আন্দোলন সংঘটিত হয়। একপর্যায়ে একই সময়ে সারাদেশব্যাপী ব্যাপক গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিচক্ষণতার অভাবে ও ঔপনিবেশিক শক্তির উন্নত অস্ত্র বলে এ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়। গণঅসন্তোষ ব্যর্থ হলেও ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। নতুন রাজনৈতিক শক্তির উন্মষ ঘটে, যা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জনগণের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

ক. ফোর্ট উইলিয়াম কোথায় অবস্থিত?

খ. নওয়াব আবদুল লতিফের সংস্কার মূল লক্ষ্য কী?

গ. উদ্দীপকের সাথে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতবর্ষের কোন ঘটনার সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। [সকল বোর্ড '১৮]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

টপিক – ১১ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল কেন? (সকল বোর্ড '১৫)

ক. ভারতবর্ষ শাসনের জন্য
খ. বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে
গ. ফরাসিদের দমনের জন্য
ঘ. পর্তুগিজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে

২. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি কোথায় অবস্থিত? সকল বোর্ড '১৯]

ক. সুতানটি
খ. গোবিন্দপুর
গ. কলকাতা
ঘ. বিহার

৩. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?

ক. আলী শাহ্
খ. আলীবর্দী খান
গ. সিরাজদ্দৌলা
ঘ. সুজাউদ্দৌলা

৪. পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

ক. ১৭৫৬ সালে
খ. ১৭৫৭ সালে
গ. ১৭৫৮ সালে
ঘ. ১৭৫৯ সালে

৫. প্রথম কোন নাবিক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন?

ক. ভাস্কো-ডা-গামা
খ. কলম্বাস
গ. ক্যাপ্টেন কুক
ঘ. আল বুকার্ক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. কারা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে?
ক. পর্তুগিজরা খ. ওলন্দাজরা গ. দিনেমাররা ঘ. ফরাসিরা
৭. কোন দেশের অধিবাসীরা ইতিহাসে ডাচ বা ওলান্দাজ নামে পরিচিত?
ক. ইংল্যান্ডের খ. হল্যান্ডের গ. গিনল্যান্ডের ঘ. ফিনল্যান্ডের
৮. কত সালে ডাচ বা ওলন্দাজরা ভারতবর্ষে আগমন করে?
ক. ১৬০০ সালে খ. ১৬০১ সালে গ. ১৬০২ সালে ঘ. ১৬০৩ সালে
৯. কত সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাটে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে?
ক. ১৬১২ সালে খ. ১৬১৩ সালে গ. ১৬১৪ সালে ঘ. ১৬১৫ সালে
১০. জব চার্নক কত টাকার বিনিময়ে কলকাতা নগর কিনে নেন?
ক. ১০০০ টাকা খ. ১২০০ টাকা গ. ১৪০০ টাকা ঘ. ১৬০০ টাকা
১১. কত খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয়?
ক. ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে গ. ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে
১২. কোন দেশীয় বণিকেরা সর্বশেষ ভারতবর্ষে আগমন করে?
ক. দিনেমার খ. ওলন্দাজ গ. পর্তুগিজ ঘ. ফরাসি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৩. কত সালে কোম্পানি কলকাতা, সুতানটি ও গেবিন্দপুর গ্রামের জমিদারি লাভ করে?

ক. ১৬৭৮ সালে খ. ১৬৮৮ সালে গ. ১৬৯৮ সালে ঘ. ১৭০৮ সালে

১৪. কোন মুঘল সম্রাট কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়?

ক. সম্রাট শাহ আলম খ. সম্রাট ফররুখশিয়ার

গ. সম্রাট বাহাদুর শাহ ঘ. সমাট দ্বিতীয় আকবর

১৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে দিওয়ানি লাভ করে? [সকল বোর্ড '১৫]

ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৬৪ গ. ১৭৬৫ ঘ. ১৭৭২

THANK YOU